বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২৪ ■ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

বিজয়ের ৫৩ বছর

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২৪

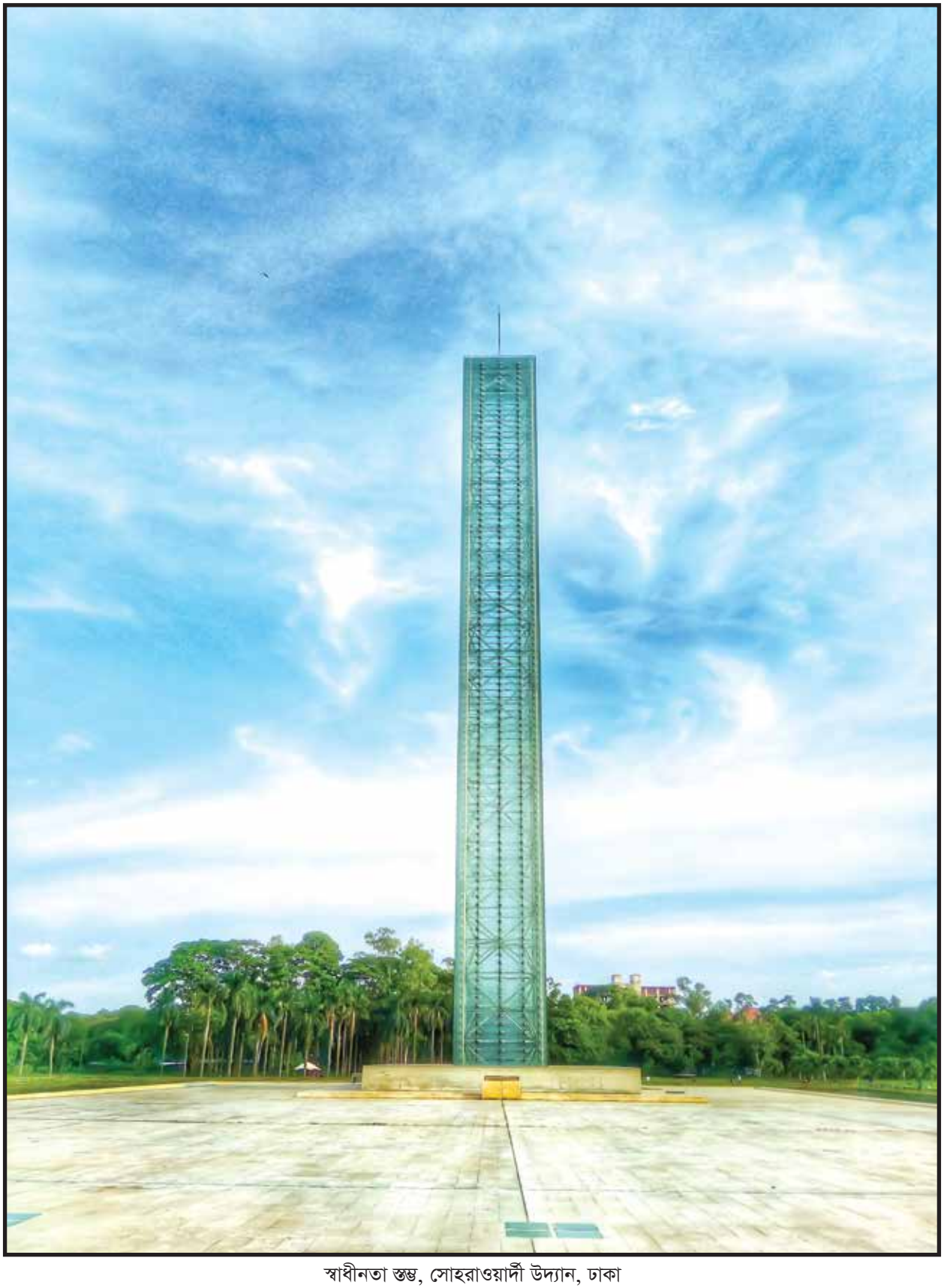

স্বাধীনতা স্তম্ভ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ডিসেম্বর ২০২৪ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ও পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট José Ramos-Horta ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৪ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করেন— পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

১৬ই ডিসেম্বর কেবল বিজয়ের প্রতীক নয়, বরং বাঙালি জাতির আত্মত্যাগ, সংগ্রাম ও সাহসিকতার চূড়ান্ত ফলাফল। এটি আমাদের জাতীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য ও গৌরবময় দিনগুলোর একটি। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর আমরা অর্জন করি স্বাধীনতা। যেই রেসকোর্স ময়দান থেকে যুদ্ধের সূচনা, সেই একই জায়গায় ৯৩ হাজার পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধ শেষে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বিপুল সৈন্যসহ আত্মসমর্পণের ঘটনা এটাই প্রথম। এই অর্জনের পেছনে রয়েছে ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণ, ২ লক্ষ নারীর ত্যাগ ও সংগ্রাম। তাই বাংলাদেশের 'বিজয় দিবস' স্বাধীনতার পথে একটি রাষ্ট্রের অভিযাত্রা সূচনার দিবস। মহান বিজয় দিবসের ৫৩ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গভীর শ্রদ্ধা জানাই মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বুদ্ধিজীবী ও নির্যাতিত মা-বোনদের।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই উজ্জীবিত করেছে ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে। বাঙালি জাতি কখনোই অপশোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে চুপ থাকেনি, যার সর্বশেষ প্রতিফলন ২০২৪-এর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। মুক্তিযুদ্ধের এই প্রেরণাকে ধারণ ও আগামীর বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় তুলে ধরতে এই সংখ্যায় রয়েছে একাধিক প্রবন্ধ, নিবন্ধ। এর মধ্যে 'বাংলাদেশ: স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা', 'স্বাধীনতা, বিজয়ের সূচনা ও গন্তব্য', 'বিজয় দিবস: ইতিহাস, দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম' ও 'নতুন বাংলাদেশে বিজয় উৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস বাংলাদেশে একটি শোকাবহ দিন। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে জাতিকে মেধাশূন্য করার নীলনকশা তৈরি করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করতেই ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের নিবন্ধ, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যা। বিজয়ের ৫৩তম বার্ষিকীতে পাঠকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করি, এই সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ/সাক্ষাৎকার

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রথম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ৪

বাংলাদেশ: স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ১০
ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

স্বাধীনতা, বিজয়ের সূচনা ও গন্তব্য ১৭
ড. মো. হাবিব জাকারিয়া

বিজয় দিবস: ইতিহাস, দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ২০
ড. সুলতানা আক্তার

স্বৈরাচার মুক্ত স্বদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মহান বিজয় দিবস পালন ২৩

নতুন বাংলাদেশে বিজয় দিবস ২৬
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: উৎস ও সহায়ক নীতি ২৯
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

সাব-সেক্টর কমান্ডার সদরুদ্দীন: উত্তর রণাঙ্গনের ক্ষীপ্র ঈগল ৩৩
ড. মো. নাজমুল হক

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবস ৩৮
জায়েদুল আলম

মুক্তিযুদ্ধকে তরুণ প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে ৪২
আলী হাসান

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় ৪৫
খান চমন-ই এলাহি

শহিদ বাচ্চু মিয়া: মুক্তিযুদ্ধে রক্তঋণ ৪৭
মিয়াজান কবীর

বিদ্রোহে বিপ্লবে বিজয়ী বাঙালি ৪৯
আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা ৫১
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

শহিদ মুখতার ইলাহি ও শহিদ আবুল কাশেম মিঞা হোক তরুণদের চেতনা ৫৫
হেলাল হোসেন কবির

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা ৬১
এস আর সবিতা

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া ৬৮
শারমিন ইসলাম

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে সরকার ৭৬
দেবব্রত রায়

গল্প:

লোকটা এখনো দৌড়ুচ্ছে ৫৭
রফিকুর রশীদ

স্বদেশের মাটির ছোঁয়া ৬৫
সুজন বড়ুয়া

চরের চালাঘরে ৭০
মাশ্‌হুদা মাধবী

কবিতাগুচ্ছ: ৬৩-৬৪, ৭৪-৭৫, ৭৮-৭৯

হাসান হাফিজ, আবু জাফর আবদুল্লাহ্, জাকির আবু জাফর, অর্ণব আশিক, চন্দনকৃষ্ণ পাল, আ. শ. ম. বাবর আলী, দেলওয়ার বিন রশিদ, আতিক রহমান, বেগম শামসুন নাহার, অদ্বৈত মারুত, বর্ণালী সান্যাল, কাদের বাবু, এস এম তিতুমীর, বোরহান মাসুদ, সুরজিত বৈদ্য, প্রত্যয় জসীম, সুজিত হালদার, সেহাঙ্গল বিপ্লব, সোহরাব পাশা, গোপেশচন্দ্র সূত্রধর, মোল্লা আলিম, সুবর্ণা অধিকারী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন কবি হেলাল হাফিজ ৮০

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৪ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রথম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

প্রিয় দেশবাসী, শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সবাইকে আমার সালাম জানাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম।

আজ জাতির এক বিশেষ দিন। বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার দিন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অনেক অস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে খালি হাতে রুখে দাঁড়িয়ে সম্মুখ সমরে লড়াই করে নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উৎসবের দিন। এই দিনে স্মরণ করি লক্ষ লক্ষ শহিদদেরকে, অগণিত শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-জনতার আত্মত্যাগকে, যার ফলে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু আমরা সেই অর্জনকে আমাদের দোষে সম্পূর্ণতা দিতে পারিনি। সর্বশেষ এবং প্রচণ্ডতম আঘাত হানল এক স্বৈরাচারী সরকার। সে প্রতিজ্ঞা করেই বসেছিল এদেশের মঙ্গল হতে পারে এমন কিছুই সে অবশিষ্ট থাকতে দেবে না।

এ বছরের বিজয় দিবস বিশেষ কারণে মহা আনন্দের দিন। মাত্র চার মাস আগে একটি অসম্ভব সম্ভব হয়ে গেল, দেশের সবাই মিলে একজোটে হুংকার দিয়ে উঠল, পৃথিবীর ঘৃণ্যতম স্বৈরাচারী শাসককে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে আমাদের প্রিয় দেশকে মুক্ত করেছে ছাত্র-জনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থান।

যে হাজার হাজার শহিদ এবং আহতদের আত্মত্যাগ এবং ছাত্র-জনতার অটুট ঐক্যের মাধ্যমে এই গণ-অভ্যুত্থান সম্ভব হলো তাদের সবাইকে স্মরণ করি এবং আজ এবারের মহা বিজয়ের দিনে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।

নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, একটি বৈষম্যহীন দেশ গড়ার তাগিদে ছাত্র-জনতা স্বৈরাচারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রক্ত দিয়ে চার মাস আগে নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল, সে ঐক্য এখনো পাথরের মতো মজবুত আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে জাতি আবার গর্জে ওঠে সমগ্র পৃথিবীকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে।

যখন পরাজিত শক্তি নড়েচড়ে ওঠার চেষ্টা করছিল, সকল রাজনৈতিক দলের এবং সকল ধর্মের শীর্ষ ব্যক্তিদের এবং ছাত্রদের সমাবেশের মাধ্যমে এক কণ্ঠে সজোরে ঘোষণা দিয়েছিল, আমরা যে নিরেট ঐক্যের মাধ্যমে অভ্যুত্থান করেছি সেই ঐক্য আরও জোরদার হয়েছে। চার মাসের ব্যবধানে আমাদের ঐক্য কোথাও শিথিল হয়নি। নতুন বাংলাদেশ গড়ার সংকল্পে আমরা অটুট আছি।

বহির্বিশ্বে চাতুর্যপূর্ণ প্রচারণা দিয়ে যারা আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তারা দূরত্ব সৃষ্টি তো করতে পারেইনি, বরং সারা জাতিকে সগৌরবে উচ্চকণ্ঠে তার ঐক্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে উজ্জীবিত করেছে।

পরাজিত শক্তি তাদের পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তারা প্রতিদিন দেশের ভেতরে এবং বাইরে থেকে জনতার অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে নানা ভঙ্গিতে তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাচার করা হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের আয়ত্তে রয়েছে। তাদের সুবিধাভোগীরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আমাদের ঐক্য অটুট থাকলে তারা আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য অর্জন থেকে ব্যর্থ করতে পারবে না। সজাগ থাকুন। নিজের লক্ষ্যকে জাতির লক্ষ্যের সঙ্গে একীভূত করুন। পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য অর্জন থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

আমি দেশের গণমাধ্যমকর্মী ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই, বিশ্বের কাছে দেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরুন। অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সত্যই হোক আমাদের হাতিয়ার।

জাতির এই নিরেট ঐক্য এই বছরের বিজয় দিবসকে স্মরণীয় করে রাখবে। ইতিহাসের অনন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবে। এই ঐতিহাসিক অর্জনের জন্য দল-মত নির্বিশেষে দেশের সকল তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই ঐক্যের জোরে আমরা আমাদের সকল সমস্যার দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করতে পারব।

এই বিজয় মাসে আমাদের গণ-অভ্যুত্থানকে অভিনন্দন জানাবার জন্য, আমাদের বিজয় দিবসে যোগ দেবার জন্য ঢাকায় এসেছেন পূর্ব তিমুরের রাষ্ট্রপতি নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস হোর্তা। তিনি তাঁর দেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ২০০২ সালে পূর্ব তিমুর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের জাতীয় উৎসবে শরিক হবার জন্য জাতির পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি।

কয়েকদিন আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৯ জন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে। এই প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রায় সকল দেশের রাষ্ট্রদূতগণ একসঙ্গে ঢাকায় এসে সরকারের সঙ্গে বৈঠক করলেন।

এই দেশগুলোর বেশির ভাগ দূতাবাস দিল্লিতে। তারা অনেকেই আগে কোনোদিন ঢাকায় আসেনওনি। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। একত্রে ঢাকায় আসলেন শুধু এই বার্তা দেবার জন্য যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ সমর্থন ও সহযোগিতা দেবার জন্য প্রস্তুত।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রক্রিয়ার কথা আমি তাদেরকে জানিয়েছি। সেটিতে তারা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং ভুল তথ্য প্রচারের বিষয়েও আমি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিকদের জানিয়েছি। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে যাদের ভিসা অফিস নয়াদিল্লিতে আছে, তাদেরকে ঢাকা বা অন্য কোনো প্রতিবেশী দেশে ভিসা অফিস নিয়ে আসার জন্য আমি অনুরোধ করেছি। আমি বলেছি, ইউরোপীয় দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ভিসা পেতে সমস্যা হয়। তারা যদি ভিসা সেন্টার ঢাকায় নিয়ে আসেন তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েদের ভোগান্তি কমে যাবে। এছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার মাত্রা বাড়ানোর বিষয়ে আমি আলাপ করেছি।

বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য সকল দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে আমাদের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সক্ষম হয়েছে। তারা নতুন উদ্যোগে এবং নতুন উৎসাহে আমাদের সঙ্গে নতুন আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছে। অর্থনীতির সাফল্যের ব্যাপারে দেশে এবং বিদেশে আস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে অর্থনীতি তখন ভেঙে পড়ার অবস্থায়। গত চার মাসে এই অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আস্থা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরে আসছে। কোনো ব্যাংক বন্ধ করে দিতে হয়নি। ব্যাংক যতই দুর্বল হোক তাকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথমদিকে আমানতকারীর টাকা উত্তোলনের ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এখন সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংককে আমানতকারীর আমানত ফেরত দেবার জন্য নতুন টাকার সরবরাহ দিতে প্রস্তুত হয়েছে। আশা করি, এতে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সকলের আস্থা ফিরে আসবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের সরকারের শুরুতেই একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলাম। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি। এই কমিটির কাজ ছিল অভ্যুত্থানের পর অর্থনীতি কোন পরিস্থিতিতে যাত্রা শুরু করল তার একটা দলিল রচনা করা। এতে কী পেলাম, কী পেলাম না, তার একটা চিত্র তুলে ধরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই কমিটিকে। ড. দেবপ্রিয়ের সভাপতিত্বে গঠিত ১২ সদস্যের শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি নির্ধারিত সময়ে এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করে আমাদের কাছে ৪০০ পৃষ্ঠার একটা বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেছে।

সামনে থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে পাচার করে নিয়ে গেছে। কেউ বলার ছিল না। কেউ দেখার ছিল না। যারা নিয়ে গেছে তাদেরকে কেউ বাধা দেয়নি। বরং সর্বস্তরে সবাই আগ্রহ সহকারে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। কারণ তারা সব আপন লোক। বিশাল বিশাল প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ঋণের টাকায়। এসব প্রকল্পের মোড়কে বিশাল বিশাল অর্থ লুটপাট করেছে। প্রকৃত ব্যয়ের চাইতে কত বেশি ব্যয় ধরে কাদের হাতে টাকাটা পাচার করে দেওয়া হয়েছে তাও এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৪ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করেন– পিআইডি

রিপোর্ট পড়ে দেশের মানুষ হতভম্ব হয়ে গেছে। দেশে-বিদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি গভীর আগ্রহ নিয়ে এই রিপোর্টটি সংগ্রহ করছে। দেশের মধ্যে পত্রপত্রিকা, সেমিনার, আলোচনাসভা, টেলিভিশনে এই নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। ফ্যাসিবাদী সরকার দেশের অর্থনীতিকে ভেঙে দিয়ে গেছে এটা সবাই বুঝতে পারছিল। কিন্তু অর্থনীতিকে কী পরিমাণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়ে গেছে তার পরিমাপ সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারছিল না। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি হিসাবনিকাশ করে এর পরিমাণ বের করে দিয়েছে।

এই রিপোর্ট পড়ে সকলে অবিশ্বাস্য চোখে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। কারো মুখে কথা বের হচ্ছে না। দিন-দুপুরে সকলের

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি তাদের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক টাকাই লুটপাট হয়েছে। দেশে এমন ধরনের পোষ্যতোষী পুঁজিবাদ তৈরি করা হয়েছিল যার সুবিধাভোগী ছিল স্বৈরাচার ও তার সহযোগীরা। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে যে পরিমাণ কর ছাড় দেওয়া হয়েছে, সেটা অর্ধেকে নামিয়ে আনা গেলে দেশের শিক্ষা বাজেট দ্বিগুণ, স্বাস্থ্য বাজেট তিনগুণ করা সম্ভব ছিল।

পাচার করা এই টাকা আপনাদেরই টাকা। তারা প্রকাশ্যে আপনাদের কষ্টার্জিত অর্থ লুট করে বিদেশে ভোগবিলাসে ব্যয় করেছে।

সম্প্রতি *গার্ডিয়ান* পত্রিকাতেও পাচার করা টাকায় গড়ে তোলা সম্পদের পাহাড় নিয়ে একটা সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পাচার করা এই সীমাহীন অর্থ এখন আবার দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করে তারা এদেশে ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টির কাজে ব্যয় করছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এ টাকা কীভাবে দেশের সংহতির বিরুদ্ধে সকল প্রকার অপপ্রচারের কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রতিবছর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে হার দেখানো হয়েছে সেটাও মনগড়া। দেশকে এবং পৃথিবীকে বলা হচ্ছিল– কী সুন্দর দেশ, বাংলাদেশ লাফিয়ে লাফিয়ে তার উন্নয়নে এগিয়ে চলছে।

এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের বড়ো কাজ হলো পাচার করা টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা। তারা তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে সেটা চেষ্টা করছে। কাজটা কঠিন, কারণ এ বিষয়ক আইন কঠিন। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংককে সাহস ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি। বার বার বলছি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আংশিক টাকা হলেও যেন ফেরত আনা যায়।

প্রিয় দেশবাসী,

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন খাতে সংস্কারের লক্ষ্যে গুম কমিশনসহ ১৫টি কমিশন গঠন করেছে। এসব কমিশন পূর্ণ উদ্যমে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। গুম কমিশন গত পরশু তাদের প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করে গেছে। গুমের শিকার বহু পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে এটা এখন প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

এই প্রতিবেদন পড়ার আগেই আপনাদেরকে সাবধান করে রাখি, এটা একটা লোমহর্ষক প্রতিবেদন। মানুষ মানুষের প্রতি কী পরিমাণ নৃশংস হতে পারে এতে আছে তার বিবরণ। অবিশ্বাস্য বর্ণনা। সরকারের আক্রোশের শিকার হয়ে ঘটনাচক্রে যারা এখনো বেঁচে আছেন তারা আজ পর্যন্ত মুখ খুলতে সাহস করছেন না। তাদের ভয় কিছুতেই কাটছে না। তাদের ভয়, হঠাৎ যদি ঐ জালেমরা আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে তাদের প্রতি এরা নৃশংসতম হবে। গত সরকারের ঘৃণ্যতম অধ্যায়ের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এই প্রতিবেদন অমর হয়ে থাকবে।

আমি আশা করছি, কমিশনগুলো এখন থেকে নিয়মিতভাবে তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা পেশ করতে থাকবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা সেটি বাস্তবায়নে প্রতিটি কমিশনই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের কথা আমি একটু আলাদাভাবে বলতে চাই, কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের ওপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি ও তারিখ।

এ প্রসঙ্গে বড়ো খবর হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়ে গেছে। কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এখন থেকে তাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হলো ভবিষ্যৎ সরকার গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করার। তারা তাদের প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছেন। তাদের হাতে অনেক কাজ।

প্রথমে সবচেয়ে বড়ো কাজ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা। এটা এমনিতেই কঠিন কাজ। এখন কাজটা আরও কঠিন হলো এজন্য যে, গত তিনটা নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ ছিল না। ভোটার তালিকা যাচাই করার সুযোগ হয়নি কারোর। গত ১৫ বছরে যারা ভোটার হবার যোগ্য হয়েছে তাদের সবার নাম ভোটার তালিকায় তোলা নিশ্চিত করতে হবে। এটা একটা বড়ো কাজ। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর এখানে গলদ রাখার কোনো সুযোগ নেই। দীর্ঘদিন পর এবার বহু তরুণ-তরুণী জীবনে প্রথমবারের মতো ভোট দেবে। অতীতে তাদেরকে সে অধিকার এবং আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তাই এবারের নির্বাচনে তাদের ভোটদান একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। এই অভিজ্ঞতাকে মসৃণ করার সমস্ত আয়োজন করতে হবে। আমার একান্ত ইচ্ছা এবারের নির্বাচনে প্রথমবারের তরুণ-তরুণী ভোটারেরা শতকরা ১০০ ভাগের কাছাকাছি সংখ্যায় ভোট দিয়ে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করুক। নির্বাচন কমিশন এবং সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলের প্রতি আমার আহ্বান, সবাই মিলে আমরা যেন এই লক্ষ্য অর্জনে নানা প্রকার সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণ করি।

এখন থেকে সবাই মিলে এমন একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারি যে, স্থানীয় নির্বাচনসহ সকল নির্বাচনে সকল কেন্দ্রে প্রথমবারের ভোটাররা ১০০ শতাংশের কাছাকাছি সংখ্যায় ভোটদান নিশ্চিত করবে। এটা নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে কোনো সরকার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেবার সাহস করতে পারবে না।

নতুন ভোটার ছাড়াও যাদের আগে থেকে ভোটার তালিকায় নাম থাকার কথা ছিল তারা ভোটার তালিকায় আছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ভুয়া ভোটারদেরকে তালিকা থেকে বের করে দিতে হবে।

এবার আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে ভোট দেওয়া নিশ্চিত করতে চাই। অতীতে আমরা এ ব্যাপারে অনেকবার আশ্বাসের কথা শুনেছি। এই সরকারের আমলে এটা যেন প্রথমবারের মতো বাস্তবায়িত হয় এটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই। এর জন্য একটা নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে।

সবকিছুই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এর সঙ্গে যদি আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়া আরও উন্নত করতে চাই, নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করতে চাই, তাহলে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিস্তৃতি ও গভীরতা অনুসারে নির্বাচন কমিশনকে সময় দিতে হবে।

আমি সকল প্রধান সংস্কারগুলো সম্পন্ন করে নির্বাচন আয়োজন করার ব্যাপারে বার বার আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়ে এসেছি। তবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদেরকে যদি, আবার বলছি 'যদি', অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয় তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়ত সম্ভব হবে। আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করি তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে। মোটাদাগে বলা যায়, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়।

প্রিয় দেশবাসী,

যে-কোনো সংস্কারের কাজে হাত দিতে গেলে রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের প্রয়োজন। এই ঐকমত্যে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া কী হবে?

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এভাবে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেঃ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রথম পর্যায়ে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এরা শীঘ্রই চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবে বলে আমি আশা করি। আমরা এই ছয় কমিশনের চেয়ারম্যানদের নিয়ে একটি 'জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন' প্রতিষ্ঠা করার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এর কাজ হবে রাজনৈতিক দলসহ সকল পক্ষের সঙ্গে মতামত বিনিময় করে যে সমস্ত বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন হবে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা।

যেহেতু জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তা বিবেচনা করে আমি এই কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করব। আমার সাথে এই কমিশনের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন অধ্যাপক আলী রিয়াজ। কমিশন প্রয়োজন মনে করলে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। প্রথমে এই ছয়টি কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাবার পর আগামী মাসেই জাতীয় ঐকমত্য গঠন কমিশন কাজ শুরু করতে পারবে বলে আমি আশা করছি।

এই নতুন কমিশনের প্রথম কাজ হবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত জরুরি, সে সমস্ত বিষয়ে তাড়াতাড়ি ঐকমত্য সৃষ্টি করা এবং সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কোন সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায় সেই ব্যাপারে পরামর্শ চূড়ান্ত করা।

প্রিয় দেশবাসী,

নির্বাচন আয়োজন ও সংস্কার ছাড়াও আপনারা আমাদের ওপর অনেকগুলো দায়িত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও মানুষের জীবনমান উন্নয়ন। ফ্যাসিবাদী সরকারের কাছ থেকে আমরা বিপর্যস্ত এক অর্থনীতি পেয়েছি। আমাদের বৈদেশিক রিজার্ভ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

২০২৪ সালের নভেম্বরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৪.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের মাসের তুলনায় ১৫.৬৩ শতাংশ বেশি। সামগ্রিকভাবে, ২০২৪ সালের জুলাই-নভেম্বর সময়কালে রপ্তানি ১৬.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। গত বছর একই সময়ে রপ্তানি আয় ছিল ১৪.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বছরের হিসেবে এই প্রান্তিকে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি ১২.৩৪ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এসবের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

গার্মেন্টস শ্রমিক ভাইবোনেরা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। তাদের বার্ষিক মজুরি ৯ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। মূল্যস্ফীতির বিষয়টি বিবেচনা করে শ্রমিক ইউনিয়ন, মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এটি নির্ধারণ করা হয়েছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আমরা এখনো পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস, মূল্যস্ফীতি শীঘ্রই কমে আসবে। গত কয়েক মাসে বাজারে কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে। আমরা সরবরাহ বাড়িয়ে, আমদানিতে শুল্ক ছাড় দিয়ে, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে এবং বাজার তদারকির মধ্য দিয়ে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। পরিবহণ খাতে চাঁদাবাজি এখনো পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। এটা সম্ভব হলে আমরা আশা করি জিনিসপত্রের দাম আরও কমে আসবে। আমরা আপনাদের কষ্টে সমব্যথী। তবে আমরা জানি সরকারের কাজ কেবল সমবেদনা জানানো নয়। আমরা আপনাদের কষ্ট কমিয়ে আনতে সকল রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আসন্ন রমজানে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখতে আমরা সবার সহযোগিতা চাই। আমরা ইতোমধ্যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা আমাদের কাছে ওয়াদা করেছে বাজারে পণ্য সরবরাহের কোনো সংকট হবে না। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে যদি কেউ কৃত্রিম কোনো সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করে আমরা তাকে কঠোর হাতে দমন করব। বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে বিকল্প কৃষি বাজার চালু করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত পতিত স্বৈরশাসক ও তার দোসরদের বিচার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এজন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করা হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য আসামিদের বিদেশি আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সব ধরনের সুযোগ তারা পাবেন। বিচার প্রক্রিয়া সাংবাদিক,

মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। বিচারের যে-কোনো অংশ চাইলে যে কেউ রেকর্ড করার সুযোগ পাবেন। আইসিটি প্রসিকিউটর করিম খান সম্প্রতি আমার সাথে দেখা করেছেন। তিনি আইসিটি প্রসিকিউটর এবং অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে সম্মত হয়েছেন এবং আইসিটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আলাদাভাবে আমরা গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা করব বলে তাকে জানিয়েছি।

প্রিয় দেশবাসী,

জুলাই বিপ্লবে বাংলাদেশের ছাত্র-শ্রমিক-জনতা মিলে যে অসাধ্য সাধন করেছে তার অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকায় ছিল এ দেশের নারীরা। ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রাণঘাতী অস্ত্রের সামনে হিমালয়ের মতো দাঁড়িয়েছিল আমাদের মেয়েরা। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, চাকরিজীবী, শ্রমজীবী— সকল পেশার, সকল বয়সের নারীরা এ আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এ বছর বেগম রোকেয়া দিবসে দেশজুড়ে আন্দোলনে নারীদের আত্মত্যাগ ও ভূমিকার বিষয়ে বড়ো আকারে আলোচনা হয়েছে। ঐদিন জুলাই কন্যারাও ঘোষণা দিয়েছে তারা তাদের কথা কাউকে ভুলে যেতে দেবে না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নারী অধিকার রক্ষায় নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন করেছে। শীঘ্রই তারা তাদের রিপোর্ট দেবে। জুলাই কন্যারা ঘোষণা দিয়েছে, প্রতি বছরের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নির্ধারিত সময়ে সারাদেশে সকল পরিবারের নারী-শিশু-কিশোরী-তরুণী-বৃদ্ধা একসঙ্গে নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে সেটা উঠান হোক, বাড়ির সামনে রাস্তায় হোক— সমাবেশ করে দেশের অর্ধেকাংশ মানুষের অস্তিত্বের কথা সারা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে দেবে।

যে তরুণীরা জুলাই আন্দোলনে সামনের সারিতে থাকল, তারা নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় থেকে আর কোনোদিন সরে যাবে না।

তারা শুধু নতুন বাংলাদেশ নয় নতুন এক পৃথিবী গড়ে তোলার মহা কর্মযজ্ঞে বাংলাদেশের সকল বয়সের নারীদের সঙ্গে নিয়ে নেতৃত্ব দেবে।

সবশেষে, এই বিজয়ের মাসে আমি বাংলাদেশের, দল-মত-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বয়স নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। শক্তিশালী স্বৈরাচারী সরকারকে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমেই আমরা হটাতে পেরেছি। তারা এখনো সর্বশক্তি দিয়ে জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যকে নস্যাৎ করতে চাচ্ছে, একের প্রতি অন্যের বিষ উগড়ে দিতে চাচ্ছে। তাদের এই হীন প্রচেষ্টাকে কোনোভাবেই সফল হতে দেবেন না।

প্রিয় দেশবাসী,

এটা আমাদের বিজয়ের মাস। ১৬ই ডিসেম্বরে যুদ্ধ জয় করে পৃথিবীর বুকে বাঙালি জাতির একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাস। শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার মাস। নিজের শক্তিকে আবিষ্কার করার মাস।

এই বিজয়ের মাসে আমরা সকল প্রস্তুতি নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে নতুন বাংলাদেশ গড়ার যাত্রা শুরু করলাম। এই যাত্রা শুভ হোক। গন্তব্যে পৌঁছানো নিশ্চিত ও আনন্দদায়ক হোক।

বিজয়ের মাস হোক নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে জাতির মহা ঐক্যের মাস।

বিজয়ের মাস হোক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে স্মরণ করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার শপথ দৃঢ়তার সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করার মাস।

বিজয়ের মাস হোক নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণদের প্রচণ্ড দুঃসাহস প্রকাশের মাস।

বিজয়ের মাস হোক নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক স্থায়ীভাবে ভয়বিহীন থাকবে এমন এক সমাজ গড়ার মাস। সংখ্যালঘুদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভয়ে ভীত হতে হবে না, নারীকে পুরুষের ভয়ে ভীত হতে হবে না, বিত্তহীনকে বিত্তবানদের ভয়ে ভীত হতে হবে না, নিজের মত প্রকাশে কারো ভয়ে ভীত হতে হবে না।

বিজয়ের মাস হোক অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রতিজ্ঞা নেবার মাস।

প্রিয় দেশবাসী,

শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী আসুন আমরা প্রাণ ভরে বিজয়ের মাস উদ্‌যাপন করি।

সকলকে বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই বিজয়ের মাস জাতির জন্য এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করুক।

আপনাদের সবাইকে আবার আমার সালাম জানাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম, মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ হাফেজ।

———— ○ ————

বাংলাদেশ: স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

রাষ্ট্রীয় সাফল্যের পরীক্ষাক্ষেত্র হচ্ছে জনসাধারণের জীবন। সেইখানে জনসাধারণের জীবনে রাষ্ট্র কোন শুভ পরিবর্তন কতটা আনতে পারল তার উপরই রাষ্ট্রের সফলতা-বিফলতা নির্ভরশীল। এই পরীক্ষায় রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, বিশেষ করে বাংলাদেশে এবং এই ব্যর্থতার মধ্যেই নিহিত ছিল পাকিস্তানের মৃত্যু। বাংলাদেশের যে জনসাধারণ একদিন ভোট দিয়ে পাকিস্তান এনেছে, সেই জনসাধারণই আবার হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। দিয়েছে এই কারণে যে, নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের যে আশা নিয়ে তারা পাকিস্তান এনেছিল, সেই আশা পূর্ণ হয়নি। বরং উল্টোটা হয়েছে, দিনে দিনে পাকিস্তান সাধারণ মানুষের দুর্গতিকে বাড়িয়ে তুলেছে। দিনে দিনে তাই অসন্তোষ বেড়েছে, বেড়েছে বিক্ষোভ, পরিণতিতে পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে।

দেশের বুদ্ধিজীবীরা যে পরিমাণে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে যুক্ত করতে পেরেছেন সেই পরিমাণেই তারা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তুলতে। কিন্তু বলাই বাহুল্য বুদ্ধিজীবী সমাজের সকল মানুষ সকল সময়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকেননি। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন নিজেদের স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থ থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে দেখে। এটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে। বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এদেশের উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি চিরদিনই আত্মস্বার্থ সচেতন। তরুণ বয়সে আত্মত্যাগের সাহস থাকে, পরিণত বয়সে আসে বিষয়বুদ্ধি। তাই পরিণত বয়সের বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতই সজাগ ছিলেন, ছিলেন আত্মসচেতন। এর আরও একটা কারণ ছিল, উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিত্তি ছিল অর্বাচীন ও দুর্বল। তাই এই শ্রেণির লোকদের পক্ষে কোনো ঝুঁকি নেওয়া কঠিন ছিল। পার্টিশনের আগে মুসলমান মধ্যবিত্তরা দেখেছিল অবিভক্ত বাংলার তুলনায় অধিকতর পুরানো ও প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে তাদের নিজস্ব শ্রেণিগত বিকাশের সুযোগ খুব সংকীর্ণ; আশা ছিল পাকিস্তানে সেই বিকাশ অনেক সহজ ও দ্রুত হবে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর মধ্যবিত্তদের মধ্যে তাই একটা ব্যস্ততা দেখা গিয়েছিল নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার। বুদ্ধিজীবীরাও

ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সুবিধা যতটা আশা করা গিয়েছিল ততটা পাওয়া যায়নি, সুযোগ অবাধ হয়নি, কিছুটা দ্রুত হয়েছিল যদিও। হিন্দুরা চলে যাওয়ায় চাকরি খালি হয়েছিল, সেগুলো পাওয়া গেল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। হিন্দু মধ্যবিত্তের জায়গায় নতুন প্রতিযোগী এসে জুটেছে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত যারা আগে থেকেই অনেকটা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য তো বটেই বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের প্রধান যে অবলম্বন চাকরি, সেই চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে শুধু শক্তিশালী প্রতিযোগী হয়ে দেখা দিলো তা নয়, চাকরির তারা মালিকও হয়ে রইল। ছোটো-বড়ো সব রকমের চাকরির। স্পষ্ট সত্য হয়ে দাঁড়ালো এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের অসন্তুষ্ট করলে জীবিকা অর্জনের পথ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে, তুষ্ট করলে উন্নতি কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। প্রধানত এই অর্থনৈতিক কারণেই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, সরে গিয়ে পাকিস্তানের গুণগানে ব্রতী হয়েছিল। এই কাজ করে তাদের লাভ হয়েছে– ব্যক্তিগতভাবে। তাছাড়া সামনে প্রত্যাশার একটা দিগন্তও দেখা যাচ্ছিল।

বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভন দেখানোর কাজ পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই করেছে। উদ্দেশ্যটা সহজ। সরকার চেয়েছে জনসাধারণকে শোষণ করতে, বুদ্ধিজীবীরা যদি জনসাধারণের অংশ হয়ে যায়। জনসাধারণের সঙ্গে থাকে তবে তারা মানুষের চোখ খুলে দিতে পারে, চোখ খুলে দিলে শোষণ করতে অসুবিধা। আর যদি বুদ্ধিজীবীদেরকে দিয়ে পাকিস্তানের মহিমা প্রচার করানো যায় তাহলে শোষণ কার্যটা আরও নির্বিঘ্নে হতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের জীবনে যেহেতু অভাব ছিল সচ্ছলতার এবং লোভ ছিল স্বাচ্ছন্দ্যের তাই অল্পতেই তারা আকৃষ্ট হতেন। চাকরিতে উন্নতি, পুস্তকের জন্য পারিশ্রমিক পরবর্তীকালে তমঘা ও পুরস্কার, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ এসবের সাহায্যে জনসাধারণ থেকে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস সরকার করেছেন, সক্ষমও হয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে। বুদ্ধিজীবী সমাজের লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবহারজীবী এদের মধ্যে বিশিষ্ট যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাদের প্রায় সকলের জীবনেই সমৃদ্ধি এসেছে। তাই পাকিস্তানের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতাবোধ না থেকে পারেনি। তাদের জীবন ও সাধারণ মানুষের জীবন বিপরীত দিকে চলেছে অনিবার্যভাবেই।

তুলনায় যারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন কম তাদের পক্ষেও সরকারি বক্তব্য সমর্থন না করে উপায় থাকেনি। এর কারণ তাদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবোধের অভাবটা ছিল আরও বেশি। তারা ভয় পেয়েছেন যে সামান্য ধাক্কাতেই তারা গড়িয়ে পড়বেন নীচের খাদে। ধাক্কার আশঙ্কা সব সময়েই ছিল– সরকার শুধু প্রলোভনই দেখায়নি, ভয়ও দেখিয়েছে। এবং প্রলোভনের তুলনায় ভয় কিছু কম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেনি। ভয়ের জন্য ভুলকে ভুল অন্যায়কে অন্যায় বলে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্তের মনেও অর্থনৈতিক অসন্তোষ ছিল। কিন্তু সেই অসন্তোষ কিম্বা তার চেয়েও বড়ো অসন্তোষ, সাধারণ মানুষের অসন্তোষকে উন্মোচিত করার মতো পর্যাপ্ত সাহস বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়নি। ভয়টা কল্পিত ভয় ছিল না। বামপন্থি বলে পরিচিত যারা প্রয়োজনবোধে তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সরকার দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে অবাধে চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ বা স্বাধীনতা কোনোদিনই ছিল না বাংলাদেশে। যেমন– পত্রপত্রিকা প্রকাশের কথা উল্লেখ করা যায়। এমনিতেই এই কাজটা দুরুহ ছিল, অর্থনৈতিক কারণে। তদুপরি পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে আগে অনুমতি নিতে হতো সরকারের। সরকারের অপছন্দ হলে চালু পত্রিকা যে-কোনো সময়ে বন্ধ করা হতো। সম্পাদককে কারাদণ্ডাদেশ দেবার উদাহরণও অজানা নয়।

প্রলোভন ও ভীতির সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার কাজ পাকিস্তান আমলে অবিরাম চলেছে এবং সফলতাও এসেছে এই দরিদ্র দেশে। তবে প্রলোভন ও ভীতির বাইরেও পাকিস্তান যে একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র এই রকম কথা কেউ কেউ বলেছেন নিজেদের বিশ্বাস থেকে। এরা হচ্ছেন আলবদর বাহিনীর শিক্ষাগুরু। ভুল শিক্ষার কারণে সংস্কারের বশে, প্রচলিত ধারণার প্রভাবে এরা ইসলামি সমাজব্যবস্থা নামে একটি বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরীক্ষাস্থল হিসেবে পাকিস্তানকে কল্পনা করেছেন। তাদের মধ্যে এমনকি সাধারণ মানুষের দুঃখে দুঃখিত মানুষও ছিলেন, তারা সমাজতন্ত্র চাইতেন, কিন্তু বলতেন এ হবে ইসলামি সমাজতন্ত্র অর্থাৎ ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়, ছিল অন্য এক ভয়, ঈশ্বরহীনতার ভয়। এই বিশ্বাস গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। গোঁড়ামি থেকে জন্ম হয়েছে আলবদরের। সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কিন্তু ইসলামের মায়া এসে এদের চিন্তাকে দূর আরবের এমন একটা মনগড়া রাজ্যে নিয়ে গেছে যেখান থেকে ফিরে আসা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। তাদের বুদ্ধিজীবী কর্মসমূহ গণবিরোধী অর্থাৎ বাংলাদেশ বিরোধী, শক্তিকেই পুষ্ট করেছে।

কিন্তু বিভ্রান্তি আরও ছিল। বিভ্রান্তি ছিল উদ্দেশ্যহীনতার, ছিল তথাকথিত আধুনিকতার। ইসলামি আদর্শের অনুসারীরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, তুলনায় তরুণ যারা তাদের একাংশ এই দ্বিতীয় বিভ্রান্তির করতলগত হয়েছেন। আর উভয় বিভ্রান্তির পেছনে হাত ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের। পাকিস্তানবাদীরা ভীষণ জোরে বলেছেন যে পাকিস্তানের পুণ্য মাটিতে বিদেশি সংস্কৃতি ও আদর্শের কোনো স্থান নেই। বলা বাহুল্য, বিদেশি সংস্কৃতি বলতে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে বিদেশি আদর্শ বলতে ধনতন্ত্রের আদর্শকে এরা প্রায় কখনোই বোঝাননি বরং সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের প্রভাবকে বিশেষ আদরের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে। পত্রপত্রিকায়, চলচ্চিত্রে, বেতারে, টেলিভিশনে, সভা-সমিতিতে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মাহাত্ম্য প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে অবাধে। ফলে এই অতিদরিদ্র ও ভয়ংকর অনগ্রসর দেশে বিলাসের অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম যেমন এসেছে তেমনি, সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এমন একটা জীবনদৃষ্টি যার পরিচয় চিহ্ন হচ্ছে অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম যেমন এসেছে তেমনি, সঙ্গে সঙ্গে, এসেছে এমন একটা জীবনদৃষ্টি যার পরিচয়চিহ্ন

হচ্ছে উদ্দেশ্যহীনতা, জীবন বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নগ্নতা। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিলাসের উপকরণসমূহ কিছু কিছু পেয়েছেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি পেয়েছেন ঐ জীবনদৃষ্টি, বলা যায় ওর জালে তারা আটকা পড়েছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন আলবদর ও সংস্কারহীন অত্যাধুনিকে খুব বড়ো একটা মিল আছে উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে প্রতিপালিত, উভয়েই দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন শুধু নয় সাধারণ মানুষের প্রতি বিদ্বিষ্টও বটে।

আমরা বুদ্ধিজীবীদের একাংশের কথা বললাম। কিন্তু এই অংশেরও সকল সদস্য সকল সময়ে যে সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধিতা করেছে তা নয়। যখন তারা বিরোধিতা করেছে তখন তার ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিপদগ্রস্ত হয়েছে ঠিক কিন্তু তাদের সেই কাজের ফলে জনতার মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে জনতার স্বার্থ আবার এগিয়েও গেছে। কাজেই বিচ্ছিন্নতার যে ধারার কথা বললাম সেই ধারাও অনেক সময় নেতিবাচক উপায়ে, অপ্রত্যক্ষরূপে নিজের অজান্তেই স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশের আন্দোলনের অগ্রগামিতাকে সহায়তা দান করেছে।

বুদ্ধিজীবী সমাজের অন্য যে অংশ জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে এক করে দেখতে পেরেছেন তাদের কাজে স্বাধীনতার আন্দোলন লাভবান হয়েছে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে। এই অংশটিই ছিল বৃহত্তর অংশ এবং এই অংশের বৃহত্তর অংশ এসেছিল তরুণসমাজের মধ্য থেকে। তারা তরুণ ছিলেন বলে তাদের মধ্যে একটা নবীন আদর্শবাদ ছিল, ছিল প্রলোভন এবং ভীতির কাছে আত্মসমর্পণ না করবার সাহস। তদুপরি পূর্ববর্তীদের তুলনায় এদের অর্থনৈতিক ভিত্তিটাও ছিল কিছুটা শক্তিশালী।

জনসাধারণের আশা পূরণের ক্ষেত্রে পাকিস্তান যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে তার প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়েছিল ১৯৪৮ সালে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অবশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেও দেশের সকল বুদ্ধিজীবীই যে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। ঢাকাতেই বুদ্ধির মুক্তি নামে একটি ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ে। এরা সংস্কারমুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার ওপর গুরুত্ব দিতেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও এদের মনের মধ্যে নানা স্থানে প্রশ্ন উঠেছিল। নজরুল ইসলামকে নিয়ে পাকিস্তানবাদীরা পরবর্তীকালে অনেক বাগাড়ম্বর করেছে, কিন্তু নজরুল ইসলাম কোনোদিনই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না, তিনি বরং আস্থা রেখেছিলেন শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে। এই আগের কথা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে, এমনকি যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে মঙ্গলের প্রত্যাশা দেখেছিলেন তারাও কিছুটা চিন্তিত না হয়ে পারেননি। চিন্তিত হয়েছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চালু করবার উদ্যোগ আয়োজন দেখে। ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকেই অধ্যাপক ও ছাত্রদের একাংশ দাবি তুললেন অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার পক্ষে। সরকারের দিক থেকে বিরোধিতা এলো প্রত্যাশিত বিরোধিতা। এবং তখনি, সেই সময়েই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের জায়গায় নতুন এক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটল, বাঙালি জাতীয়তাবাদের। ঘটনাটা তেমন কোনো ঘটা না করেই ঘটল। অধিকাংশ মানুষই লক্ষ করল না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য যে কী, এ যে কোন পর্যন্ত যাবে সেটা শাসকেরা তখন বোঝেনি, এমনকি তারাও বোঝেননি যারা শুরু করেন এই আন্দোলন।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের যখন জন্ম হয় তখন সেই জন্মের পেছনে একটি অতিপ্রধান ভূমিকা ছিল ভয়ের। মুসলিম মধ্যবিত্ত ভয় পেয়েছিল অবিভক্ত ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ নেই মনে করে। সেই ভয় তারা সংক্রমিত করে দিয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে। প্রধানত ভয়ের কারণেই– ইংরেজের ভয়, তার চেয়ে বড়ো ভয় হিন্দুর– ভয়ের তাড়নাতেই মুসলমানদের প্রায় সব ভোটই গিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানের বাক্সে। এখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই এলো এই নতুন ভয়— উর্দুর অর্থাৎ উর্দু ভাষাভাষীদের। আশঙ্কা হলো উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ফলে বাঙালিরা চিরকালের জন্য বোঝা হয়ে যাবে, তারা গোলাম হয়ে যাবে পাঞ্জাবিদের। বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো সেই ভয় জাগিয়ে দিলো মানুষকে— প্রথমে বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি অংশকে, পরে ছাত্রদের এবং তারও পরে সমগ্র দেশবাসীকে। বড়ো ভয় এসে ছোটো ভয়কে, নিরাপত্তার ভয়কে, ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করতে না পারার ভয়কে জয় করে নিলো। ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালি দেখল তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তখন মরিয়া হয়ে ওঠা ভিন্ন অন্য কোনো পথ রইল না। যে শাসকেরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল সেই শাসকেরাই আজ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলাদেশের সকল মানুষের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন সেই জ্ঞানটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে এনে দিলো। শাসকদের স্ববিরোধিতার পুরাতন নাটক এইখানেও নতুন করে অভিনীত হলো, স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েই তারা স্বার্থ বিনষ্ট করল।

বলাই বাহুল্য যে, রাষ্ট্রভাষা আন্দালন শুধু রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না। থাকলে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হতো না। এই আন্দোলন অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত এর গতিধারা প্রসারিত। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা এ দেশের পুরাতন ব্যাধি, ইংরেজ আমলে এই ব্যাধির প্রকোপে আমরা অনেক দুর্ভোগ ভোগ করেছি। পাশাপাশি থেকেও দুই সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, নিজেদের স্বার্থকে এক করে দেখতে পায়নি। ইংরেজ যুগে সৃষ্ট অতিশয় সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবন ও লেখকদের উপস্থিতির সামান্যতাটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, মুসলমান মধ্যবিত্ত সত্যি সত্যি পিছিয়ে পড়েছিল এবং হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি যাতে করে সাহিত্যে মুসলিম জীবন অনায়াসে বিচিত্র হতে

পারে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ রদ করা সম্ভব হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৯৪৭-এর বঙ্গভঙ্গ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বিভাগ মুসলমান মধ্যবিত্ত তো চেয়েছিল বটেই, শেষ পর্যন্ত হিন্দু মধ্যবিত্তের পক্ষেও না চেয়ে উপায় থাকেনি। ১৯০৫-এর যারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন ১৯৪৭-এর তারা আর বিরোধী থাকতে পারেননি। এইরকমের একটা সাম্প্রদায়িক পরিবেশে, সাম্প্রদায়িকতার ফলে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রে এত তাড়াতাড়ি যে একটি অসাম্প্রদায়িক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠতে পারল এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে পাকিস্তানের ব্যর্থতা ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং সেই ব্যর্থতা দেখে বাংলাদেশের মানুষ ভয় পেয়েছিল।

শুধু অসাম্প্রদায়িক নয়, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও বটে। সমাজতন্ত্রের কথা আন্দোলনের কালে স্পষ্ট করে বলা হয়নি বটে, কিন্তু সন্দেহ নেই এ আন্দোলন ছিল সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার আন্দোলন। বাংলাদেশের সন্ত্রস্ত মুসলমানেরা একদিন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, এর সাহায্যে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করবে বলে। সেই অস্ত্র যখন বরং উল্টো কাজ করবে বলে ভয় হলো, তখন তারা একে পরিত্যাগ করে অন্য একটা অস্ত্রকে শাণিত করে তুলতে চাইল, বাঙালি জাতীয়বাদের অস্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই অস্ত্রই মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করেছে, যুদ্ধাস্ত্রের সঙ্গে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একটি সম্পূর্ণ নতুন ও অতিশয় প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সরবরাহ করেছে তরুণ ছাত্রদের জীবনে। সে অভিজ্ঞতা আত্মত্যাগের ও নির্যাতনভোগের। বাংলাদেশের মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করেনি, পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত দেয়নি বলে তরুণসমাজের মনে একটা লজ্জা ছিল। ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে যখন রক্ত বইল, যখন কারাভোগ এলো, এলো পুলিশের পিছু নেওয়া, তখন লজ্জা ঘুচল কিছুটা, দ্বিধা কাটল অনেক পরিমাণে, দৃঢ়চিত্ততা এলো সঙ্গে সঙ্গে।

এ দেশের লেখক, সাংবাদিক, গায়ক, চিত্রকর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যে শিল্পের যে পরিমাণ উপাদান যত সহজে পেয়েছেন তেমন অন্য কোথাও পাননি। একুশে ফেব্রুয়ারি কোনোদিন ম্লান হয়নি, ১৯৫২ সালের পর প্রতিটি বছর উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। বাইরে, রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির আবেদন কমেনি, ক্রমশ বেড়েছে। তার কারণ এই আন্দোলন শক্তি পেয়েছে পাকিস্তানের ব্যর্থতা থেকে, যে ব্যর্থতার বোঝা দিনকে দিন বাড়ছিল; শক্তি পেয়েছে জনসাধারণের অসন্তোষ থেকে, যে অসন্তোষও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের পুঞ্জীভূত রূপ হচ্ছে এই আন্দোলন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের দাবিদার মুসলিম লীগকে সম্পূর্ণরূপে পর্যদুস্ত করে দিয়ে সাধারণ মানুষ জানিয়ে দিলো যে মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানের হাতে তাদের স্বার্থ যে নিরাপদ নয় এ সত্য তাদের কাছে আর অস্পষ্ট নয়। পরে এই সত্য আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, যত প্রত্যক্ষ

হয়েছে তত বেড়েছে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ সব সময়ে প্রকাশের পথ পায়নি, যখন পায়নি তখন তা আরও বেশি দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান জোগাতে পেরেছে আরও এই কারণে যে এই আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা অত্যন্ত বড়ো পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিম মধ্যবিত্তের দৃষ্টি অনেক সময়ে ছিল পশ্চিমমুখো, তাদের মনে অভিমান ছিল, তাদের মাতৃভাষা বাংলা কি না এ নিয়েও এক সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি বুদ্ধিজীবীদেরকে দেশের সঙ্গে একাত্ম করে দিলো। তারা ঘরে ফিরে এলেন গভীর ভালোবাসা নিয়ে। তারা দেশের মানুষের হৃদয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এতদিন ধর্ম ছিল ঐক্যের বন্ধন, এখন সেখানে এলো ভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারির পর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী যখন দেশের কথা বলেছেন তখন অধিকাংশ সময় তারা আসলে বাংলাদেশের কথাই বলেছেন, পাকিস্তানের কথা নয়। দেশপ্রেম তাদের দেশদ্রোহী করেছে এক অর্থে। বায়ান্নর পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মমতার ক্ষেত্রে, চর্চার ক্ষেত্রে বান ডেকে জোয়ার এসেছে। রচনার উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক পরিমাণে। এর ফলে শুধু যে ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তা নয়, মানুষের মধ্যে ঐক্যের বোধ বেড়েছে, বেড়েছে সচেতনতা, বেড়েছে সুন্দরতর জীবনের প্রতি আকর্ষণ। বাইরে যাই বলুক পাকিস্তানের শাসকরা একুশে ফেব্রুয়ারিকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছিল, তাই গণহত্যা শুরু করেই তারা ছুটে গিয়েছিল শহিদমিনারের দিকে, মিনারকে ভেঙে দিয়ে আক্রোশ মিটিয়েছিল তারা। আর মিনারের জায়গায় মসজিদ তৈরি করে তারা তাদের পুরাতন কৌশল নতুন করে প্রকাশ করেছিল: কৌশলটা হলো ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টি করে বিক্ষোভকে স্তিমিত করা।

বাংলা ভাষার ব্যাপারে পশ্চিমা শাসকবর্গ একগুয়েমির পরিচয় দিয়েছে প্রথমটায়। হয়ত তার পেছনে ভয় ছিল, স্বার্থ নষ্ট হবার ভয়, কিন্তু পরে যখন তারা দেখেছে যে এ আন্দোলন কিছুতেই স্তব্ধ হবার নয় তখন ১৯৫৬ সালের এবং পরে ১৯৬২ সালের সংবিধানে বাংলাকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু ততদিনে বাংলাদেশের মানুষ আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে, পাকিস্তানে যে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই এটা তাদের জানা হয়ে গেছে, এবং জানা হয়ে গেছে বলে ততদিনে তারা শুধু ভাষার অধিকার নয়, পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি করেছে।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সচেতনতা ও বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ যত বৃদ্ধি পেয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে তত বেশি চেষ্টা হয়েছে তাদের প্রলুব্ধ করবার। বুদ্ধিজীবীদের পেছনে আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে, পুরস্কার পারিতোষিকের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। বাইরে থেকে মনে হয়েছে প্রলোভনের জালে অনেকেই ধরা দিচ্ছেন। ধরা দিয়েছেন কেউ কেউ, কিন্তু এমনকি যারা দিয়েছেনও তারাও দেখা গেছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারছেন না। তার কারণ পাকিস্তানের কৃত্রিমতাটা তাদের কাছে ততদিনে ধরা পড়ে গেছে। পাকিস্তানের শাসকরা চিরকালই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে ছিল, সেই দূরত্ব যে ক্রমশ বাড়ছে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সেটাও লক্ষ না করে উপায় ছিল না। সরকার টাকা দিলো, কিন্তু মন পেল না। তমঘা দিলো, সেই তমঘা পরে কেউ কেউ পরিত্যাগ করলেন, করে বিব্রত করলেন সরকারকে। সরকার সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দিলো, কিন্তু সেই পুরস্কার সরকারবিরোধীরা পাওয়া শুরু করলেন। এমনকি পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থার উপর প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপকারী রচনাও পুরস্কার নিয়ে গেল। সরকার টাকা দিলো লেখক সংঘ গড়বার জন্য, কিন্তু বাংলাদেশে দেখা গেল লেখক সংঘ সরকারি নীতির সমর্থন তো করছেই না, পরন্তু প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছে।

সরকার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও পশ্চিম পাকিস্তানের ইতিহাস যে অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত তা প্রমাণ করার জন্য। কিন্তু ইতিহাস তো সরকারের কেনা গোলাম নয়, ইতিহাস ঐ কৃত্রিম ছকে আবদ্ধ হতে রাজি হয়নি। অতীতের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা সফল হয়নি, বাংলাদেশের মানুষ তাতে আস্থা রাখেনি; এবং চলমান ইতিহাসের ধারা তো চোখের সামনেই দেখা গেছে দুই ভিন্ন দিকে চলেছে। চেষ্টা হয়েছে এটা প্রমাণ করার যে বাংলা ও উর্দু ভাষার মধ্যে সাধারণ ঐতিহ্য আছে, আছে নিকটবর্তিতা। কিন্তু এসব কথাতেও বাংলাদেশের মানুষ সাড়া দেয়নি উর্দু যে বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এ কথা তারা কিছুতেই ভুলতে পারেনি। বাংলা ভাষাকে শিক্ষা ও সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে প্রয়োগ করার দাবি বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তুলেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও দাবি উঠেছে উর্দুর পক্ষে। মাতৃভাষাকে জীবনের সর্বত্র প্রচলিত করার পক্ষে দুই পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা অনেক সময় একসঙ্গে কথা বলেছেন। তারা বলেছেন এই দাবি গভীর দেশপ্রেম থেকে উৎসারিত। তা উৎসারিত ঠিকই, কিন্তু সে দেশ এক দেশ নয়, দুই দেশ। উর্দু প্রচলনের দাবি বাংলার আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। সরকার চেষ্টা করেছে ধর্মের কথা বলতে, পাকিস্তান না থাকলে ইসলাম থাকবে না, ইসলাম না থাকলে বেঁচে থেকে কী লাভ এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করতে, কিন্তু এই ধর্মীয় প্রতারণাতেও কোনো সুফল হয়নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই একদিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে এখানেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে নানাভাবে বাঁধবার চেষ্টা করা হয়েছে। কালা-কানুন চালু করে এর যে স্বাধীনতাটুকু এমনকি ইংরেজ আমলে চালু ছিল সেটাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপকদের লেখা ও মতামত প্রকাশের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে আবার চেষ্টা করা হয়েছে তাদেরকে প্রলুব্ধ করবার। শুধু দেশি সরকার নয়, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহও বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল একটি সুবিধাভোগী শ্রেণি সৃষ্টির জন্য, সেই শ্রেণি

এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরও গড়ে উঠেছিল। দুর্বলচিত্ত ও লোভী মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু তবু বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক ভূমিকা ছিল জনসাধারণের অর্থাৎ বাংলাদেশের পক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পাকিস্তানবাদী ছিলেন তারা চুপ করে ছিলেন না, তাদের পেছনে সরকারের সমর্থন ও সহায়তা ছিল, কিন্তু তবু তাদের কাজ দেশের উপর বড়ো কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি, বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেছে। ইংরেজরা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করত, পাকিস্তানিরা আরও বেশি করত সংগত কারণেই। অবিশ্বাস করত বলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে তাদের কোনো উৎসাহ ছিল না। চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হলো শহর থেকে অনেক দূরে, পাহাড়ের মধ্যে। সাভারের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার পরিকল্পনা সরল, নাম দিলো মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, জায়গা করল ঢাকা শহর থেকে দূরে লোকবসতিহীন এক প্রান্তরে। এক সময়ে চেষ্টা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। উদ্দেশ্যটার মধ্যে কোনো লুকোচুরি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না পরিপূর্ণভাবে, তাকে রাখতে হবে জনজীবন থেকে দূরে; কেননা বিশ্ববিদ্যালয় যদি বড়ো হয়, অনেক হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি শহরের মাঝখানে থাকে তবে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা 'রাজনীতি' করবে, অর্থাৎ অধিকারের কথা বলবে, প্রতিষ্ঠার জন্য সভা-শোভাযাত্রা-বিক্ষোভ শুরু করে দেবে। অবিশ্বাস শুধু নয় ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড একটা ক্রোধ ছিল শাসকদের। যার প্রমাণ পাওয়া গেল তখন যখন গণহত্যার সূচনাতেই মিলিটারি ছুটে এলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এসে ছাত্র-শিক্ষক যাকে পেল হাতের কাছে গুলি করে হত্যা করল, দালানকোঠাও রক্ষা পেল না। আত্মসমর্পণের আগে আবার তারা অনুচরদের পাঠিয়েছে বেছে বেছে বাংলাদেশের আন্দোলন সমর্থনকারী শিক্ষকদের হত্যা করার জন্য।

শুধু শিক্ষক বলে নয়, গোটা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিই আক্রোশ ছিল। হানাদারদের পরিকল্পনা ছিল প্রত্যেক শহরে তারা ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধিজীবী নিধন করে যাবে আত্মসমর্পণের আগে। এবং কাজ তারা শুরুও করেছিল, শেষ করে যেতে পারেনি এটাই যা রক্ষা। এর কারণ বুদ্ধিজীবীদের উসকানিতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হতে চেয়েছে বলে তাদের ধারণা। বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী বলে কেউ না থাকুক, থাকুক শুধু সাধারণ মানুষ এটাই তাদের কল্পনার স্বর্গ ছিল, কেননা তাহলে তাদের ধারণা তারা অনাদিকাল ধরে এই দেশে শোষণকার্য অব্যাহত রাখতে পারত। সন্দেহ নেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বুদ্ধিজীবী সমাজের অধিকাংশ মানুষ সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন, অনেক সময়ে ছিলেন অগ্রবর্তীও।

বাংলার অর্থনীতিবিদদের একটি অংশ সাধারণ মানুষের সচেতনতাকে অনেকটা অগ্রসর করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ যে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে এটা সকলেরই জানা ছিল। অর্থনীতিবিদেরা সেই সত্যটা আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ১৯৫৪-র সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে তারা দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতি পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রে ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়ছে। সরকার তথ্য বিকৃত করত, অনেক তথ্য বাঙালি অর্থনীতিবিদদের হাতে আসত না, কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের উচ্চপদে বাঙালিদের নিয়োগ করা হতো না, তবুও অর্থনীতিবিদদের এটা বুঝেছিলেন যে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে দুটিই স্বতন্ত্র অর্থনীতি চালু করা প্রয়োজন। শেষ দিকে দুই অঞ্চলের অর্থনীতিকদের মধ্যে মতবিরোধ এত প্রবল হতো যে তারা কোনো কোনো ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করতেন। আইয়ুব খান চতুর লোক ছিলেন, দুই অর্থনীতির দাবি তার সময়েই জোরেশোরে উঠেছিল, এবং তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে দুই অর্থনীতির পরিণাম দুই পাকিস্তান। আইয়ুব খান এই দাবি স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন ধমক দিয়ে, অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করার হুমকি দিয়ে। কিন্তু তাতে সত্য অসত্য হয়ে যায়নি, ফাটল জোড়া লাগেনি। ফাটল শুরু হয়েছিল ভাষাকে কেন্দ্র করে, অর্থনীতি সেই ফাটলকে ক্রমশ বাড়িয়ে দিয়েছে, পরিণতিতে শুধু দুই অর্থনীতি বা দুই পাকিস্তান নয়, দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষার ফাটলের কথাও আইয়ুব খান জানতেন। পতনের আগে তিনি একবার দুই অঞ্চলের জন্য একটি সাধারণ ভাষা সৃষ্টি করার কথা বলেছিলেন। সন্দেহ নেই সে কাজ করতে গেলে ফাটল তো বন্ধ হতই না, বরং আরও বৃদ্ধি পেত।

প্রত্যক্ষ ভূমিকার বাইরে বুদ্ধিজীবীদের অপ্রত্যক্ষ ভূমিকাটাও কম গুরুত্বের নয়। বাংলাদেশে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা কম তাই শিক্ষিতের মর্যাদা বেশি। সম্মান প্রদর্শনের অভ্যাসও এদেশে পুরাতন। বুদ্ধিজীবীদের তাই এদেশে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান আছে। সেই জন্যই দেখা যায় বুদ্ধিজীবীদের উপর যখন আক্রমণ এসেছে তখন আহত হয়েছে সমগ্র দেশ, বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে দেশের সাধারণ মানুষ। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরুতে ছিল মূলত ছাত্রদের আন্দোলন, কিন্তু যে মুহূর্তে গুলি চলল ছাত্রদের উপর, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নেমে এলো শিক্ষকদের উপর তখনি, অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে, ছাত্র আন্দোলন লেলিহান গণ-আন্দোলনে পর্যবসিত হলো। তেমনিভাবে উনসত্তরের আন্দোলন তার চরমরূপ পরিগ্রহ করল সেই মুহূর্তে খবর প্রচার হলো যে, মিলিটারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জোহাকে গুলি করে হত্যা করেছে। ঢাকায় তখন কার্ফু ছিল, কিন্তু ঐ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে হাজার হাজার মানুষ বার হয়ে এসেছিল রাস্তায়। কেউ তাদের বলেনি বার হয়ে আসতে, ড. জোহাকে তারা জানে না, বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাকুক, কোনো বিদ্যালয়েই যায়নি তাদের অধিকাংশ মানুষ, কিন্তু তবু ড. জোহার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে তারা তাদের নিজেদের অপমানকে দেখল, দেখল তাদের নিজেদের অস্তিত্বের উপর নৃশংস এক আক্রমণকে। ফলে আন্দোলন এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, তার স্রোতে আইয়ুব খান-মোনেম খান ভেসে চলে গেল কোথায়।

উনসত্তরের আন্দোলনের সময় যারা প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্র দুটির অফিস পুড়িয়েছে তাদের অনেকেই হয়ত সংবাদপত্র পড়ে না, কিন্তু তারা জানত সংবাদপত্র দুটি তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছিল। অন্যদিকে সরকার যখন যে-পত্রিকার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছে তখন সেই পত্রিকাকে জনসাধারণ আদর করে বুকে তুলে নিয়েছে। *দৈনিক ইত্তেফাক* সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল সেই সময়ে যখন তার প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল, যখন তার সম্পাদক কারারুদ্ধ ছিলেন। পুস্তক নিষিদ্ধ করার কাজে সরকারের উৎসাহ ছিল, কিন্তু শেষের দিকে সরকার আর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করতে সাহস পায়নি, প্রচার করলেও সে নিষেধাজ্ঞা মান্য করা হয়নি।

১৯৭১-এর গণহত্যা যখন শুরু হয় তখন বাংলাদেশের মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি মর্মান্তিকভাবে বেজেছে যে ঘটনা সেটা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ড। দেশে-বিদেশ বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে ছিল এই ঘটনার পর নিশ্চিত জেনেছে যে পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোনো পথে বাঙালির বাঁচার উপায় নেই।

বুদ্ধিজীবীদের যে অংশ জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরকারের তাবেদার হিসেবে কাজ করেছে তাদের প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে। আটষট্টি সালে 'অগ্রগতির দশ বছরে'র গুণকীর্তন করে যখন প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে একটি করে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছিল, যখন প্রতিদিন মস্ত মস্ত ছবি ছাপা হচ্ছিল আইয়ুব খানের তখন সেই সমারোহ যেমন করে বিশিষ্ট করে তুলছিল পাঠকদের (যার খবর প্রচারকরা রাখত না), তেমনিভাবে প্রলুব্ধ ও স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার বর্ধিষ্ণু সমারোহও ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল মানুষের মনে। বিশেষ করে আইয়ুব রাজত্বকালে, কেননা সেই কালেই উদ্যোগ আয়োজনটা বেড়েছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ মীরজাফরদের জন্ম যেমন দিয়েছে তেমনি তাদের ঘৃণা করতেও কার্পণ্য করেনি।

তারচেয়েও বড়ো কথা এই সুবিধাভোগী ও ক্ষেত্রবিশেষে নির্বোধ, বুদ্ধিজীবীদের লেখায়-বক্তৃতায় ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। তারা যা ভালো বলেছেন জনসাধারণ নিশ্চিত জেনেছে যে, তা মন্দ না হয়ে যায় না। তারা যার পক্ষে থেকেছেন জনসাধারণ তার বিপক্ষে গেছে। অবশ্য এরা পক্ষে যত না বলেছেন বিপক্ষে বলেছেন তার চেয়ে বেশি, কেননা এদের প্রধান চরিত্র হচ্ছে বর্জনবাদীর। এরা বলেছেন ইকবাল অতি মহৎ কবি, বাংলাদেশের মানুষ সেই মহত্ত্ব দেখতে পায়নি। এরা বলেছেন রবীন্দ্রনাথকে বর্জন কর, যত বলেছেন এই কথা, তত জনপ্রিয়তা বেড়েছে রবীন্দ্রনাথের, তত বেশি দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশের মানুষ আঁকড়ে ধরেছে রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ কবি থাকেননি, তিনি জাতীয় বীরে পরিণত হয়েছেন, তার গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এরা বলেছেন বাংলা ভাষাকে ইসলামি কর, যত বলেছেন, তত বেড়েছে সমগ্র বাংলা ভাষার প্রতি মানুষের প্রীতি ও আকর্ষণ। হরফ বদলানোর পরামর্শ এরা দিয়েছেন, সেই পরামর্শ সকলে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা বলেছেন নজরুল ইসলামের সংস্কার আবশ্যক, সাধারণ মানুষ বলেছে নজরুল ইসলাম আমাদের একান্ত আপনার জন। এরা বলেছে পুঁথি সাহিত্যই আসল সাহিত্য, সাধারণ পাঠক বুঝে নিয়েছে পুঁথি সাহিত্যের পক্ষে ঐ প্রচারে ফাঁকি আছে। মোটকথা, এদের কাজ সম্পূর্ণ বিপরীত ফল উৎপাদন করেছে। তার কারণ এই যে, সাধারণ মানুষ জানত এরা তাদের স্বার্থের শত্রু এরা তাদের বন্ধু নন, এদের উদ্দেশ্য পশ্চিমাদের শোষণ ব্যবস্থাটাকে কায়েমি করে রাখা।

এইভাবে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন যে সকল বুদ্ধিজীবী তারাও নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরোক্ষে জনতার উপকারই করেছেন। জনতার দৃষ্টি খুলে দিতে তারাও সাহায্য করেছেন, এই করে জনতার আন্দোলনকে তারাও এগিয়ে দিয়েছেন।

বুদ্ধিজীবী সমাজের যে অংশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিলেন তারা বিবেকবান ছিলেন সত্য, কিন্তু তারাও আসলে নিজেদের স্বার্থেই কাজ করেছেন, তবে তফাৎ এই যে, তাদের স্বার্থকে তারা জনসাধারণের স্বার্থ থেকে ভিন্ন করে দেখেননি। এবং উভয়ে স্বার্থ যেহেতু ছিল এক ও অভিন্ন, তাই তাদের প্রস্তুতি ছিল না, যদিও পরবর্তীকালে প্রচার করা হয়েছিল যে, বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রয়োজনেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের আন্দোলনও কোনো গ্রন্থপাঠ থেকে শুরু হয়নি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে ছিলেন, এই আন্দোলনে তারা সরাসরি নেতৃত্ব দেননি, আন্দোলন যখন এগিয়ে গেছে তখন তার গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতেও হয় তারা পারেননি, পিছিয়ে পড়েছেন, তবু তারা সঙ্গেই ছিলেন, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সভা করে গুলিবর্ষণের নিন্দা করেছেন, ফলে তাদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উনসত্তরের এবং একাত্তরের আন্দোলনের সময় শিক্ষকরা রাজপথে শোভাযাত্রা করেছেন।

এসব ঘটনা ছোট্ট ঘটনা। কিন্তু এগুলোর তাৎপর্য আছে। তাৎপর্য এই যে, বোঝা গেছে বিক্ষোভ সার্বজনীন হয়ে উঠেছে, তারচেয়ে বড়ো কথা বোঝা গেছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষ এক হয়ে গেছে। সেই একতার দরুনই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

জনতার সঙ্গে চলা বুদ্ধিজীবী সমাজ জনতার অগ্রবর্তী অংশ হিসেবেই কাজ করেছে। পাকিস্তানের ব্যর্থতার লক্ষণ প্রথমে ধরা পড়েছে তাদের কাছেই পরে তারাই প্রমাণ পেয়েছেন সেই ব্যর্থতার। তারাই বুঝেছেন ভাষার উপর আক্রমণের অর্থ কী, অর্থনীতির গতি কোন দিকে। সেই জ্ঞানকে তারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বাকি কাজটা সাধারণ মানুষ নিজেরাই করেছে। বাংলাদেশকে তারা স্বাধীন করে নিয়েছে নিজের হাতে।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা, বিজয়ের সূচনা ও গন্তব্য

ড. মো. হাবিব জাকারিয়া

১৬ই ডিসেম্বর, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিজয় দিবস, এই ভূখণ্ডবাসীর স্বঘোষিত অস্তিত্বের বিজয় দিবস। এই বিজয়কে প্রথমত একটি রক্তক্ষয়ী, বেদনাবিধুর যুদ্ধে অর্জিত বিজয় হিসেবে দেখা যেতে পারে। কারণ, ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও নতুন রাষ্ট্র গঠনের অভীপ্সায় সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এই তারিখে। আবার এই প্রায় নয় মাস সময়কে এ অঞ্চলের মানুষের বহুকালের অবদমিত বাসনার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ হিসেবেও দেখা যেতে পারে, যে বাসনার নাম স্বাধীনতা। সেভাবে দেখলে সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস এসে ১৬ই ডিসেম্বরে লীন হয়। এই লেখা দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে। এরপর বলতেই হয়, মহাবয়ান ও সত্য এক থাকলেও অর্জিত বিজয় ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গ ১৯৭২ সালে যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, ১৯৯০-এ এসে তা বদলে গেছে এবং ২০২৪ সালে এসে স্বভাবতই আরও বদলাবে। কেননা, একাত্তর কেবল একাত্তরই নয়, এর পূর্বে রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস, পরে রয়েছে আরও ৫৩ বছরের ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহ। ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অর্জিত স্বাধীনতা ও বিজয়কে এই সামগ্রিক ঐতিহাসিক প্রবাহ-পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই।

এই লেখা ১৯৭১-পূর্ববর্তী সকল ইতিহাসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে ১৬ই ডিসেম্বরকে কেবল ভূখণ্ডের স্বাধীনতা অর্জন এবং নতুন রাষ্ট্র গঠনের পথে বিজয় দিবস হিসেবে দেখার পক্ষে। কারণ স্বাধীনতা একটি বহুমাত্রিক এবং গণমানুষের বহুস্তরিক মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণা। যাকে উপরিতল থেকে কেবল রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রসঙ্গ হিসেবে দেখার চল রয়েছে। কিন্তু অবশ্যই রাষ্ট্রের পাশাপাশি পৃথকভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতি ইত্যাকার প্রসঙ্গের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে, সমান্তরালে স্বাধীনতাকে বিবেচনা করতে হবে। বিজয়ের সূচনা হতে পারে ভূখণ্ড ও রাষ্ট্র থেকে, কিন্তু গন্তব্য জাতি, সমাজ ও পরিবার হয়ে ব্যক্তি অবধি। বিগত ৫৩ বছর সেখানেই তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও বিভিন্ন জাতিসত্তাকে পরাধীন রেখে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্থহীন। ব্যক্তির অস্তিত্ব, উল্লিখিত বিবিধ যৌথ অস্তিত্বের স্বভাব-প্রকৃতি ও বাসনার স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সফল হতে পারে না। সেই আলাপে গিয়ে 'স্বাধীনতা' প্রসঙ্গটি অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই জটিল হয়ে ওঠে। এই জটিলতাকে সাদরে গ্রহণের বিকল্প নেই।

ভূখণ্ড ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সাধারণত উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেখানে স্বাধীনতা অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক নির্মাণ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ তা অর্জন করেছে। এমতাবস্থায়, রাষ্ট্র যেহেতু নানাভাবেই একটি প্রবল শক্তিশালী সংগঠন, সুতরাং স্বাধীনতা ও বিজয় প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্নটিই দাঁড়াবে বাংলাদেশ নামক বহুজাতিক রাষ্ট্র এই ভূখণ্ডে বসবাসরত সকল জাতিসত্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পেরেছে কি না? জাতিগত স্বাধীনতা বলতে সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট জাতিসত্তার ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকারকে বোঝায়। যদি বাংলাদেশে বসবাসরত

সকল জাতিসত্তা এই চারটি প্রসঙ্গে স্বাধীন বোধ করে, তবে বলা যেতে পারে হ্যাঁ, বিজয় অর্জিত হবার পথে এই রাষ্ট্র এগিয়ে গেছে।

এরপর আসা যাক সামাজিক স্বাধীনতার প্রসঙ্গে। সামাজিক স্বাধীনতার প্রশ্নে অনেকগুলো ক্ষেত্র চলে আসে, যেমন– সুনির্দিষ্ট সমাজের আত্মপরিচয়ের স্বাধীনতা, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যৌথ হবার, ধর্ম পালনের, বৈবাহিক, স্বতন্ত্র শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাষার, প্রতিবাদের, গোপনীয়তার, আইন ও বিচার বিষয়ক সুরক্ষার, বাসস্থান নির্বাচনের, তথ্যের অধিকার ও ডিজিটাল স্বাধীনতা এবং লিঙ্গ সমতার স্বাধীনতা। এমন আরও বহু প্রসঙ্গের অবতারণা সম্ভব। কিন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গ হচ্ছে, রাষ্ট্র সমাজ নয়, আবার সমাজ ধ্রুব-স্থবির কোনো প্রতিষ্ঠানও নয়। ফলে বিচিত্র ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে বহমান বহু সমাজ উপরিউক্ত সকল ক্ষেত্রে স্বাধীন বোধ করলে বলা যেতে পারে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিজয় অর্জিত হবার পথে সচল-সক্রিয় রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে অদ্যাবধি জাতি ও সমাজ যথেষ্ট প্রভাববিস্তারী সংগঠন। যে সকল রাষ্ট্রে জাতি ও সমাজ অকার্যকর হয়ে গেছে রাষ্ট্রের প্রবল সাংগঠনিক শক্তি ও আধিপত্যের কারণে, সেই রাষ্ট্রগুলোকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করার কিছু নেই। ফলে রাষ্ট্রকে একচ্ছত্র আধিপত্যের জায়গায় না নেওয়াটা স্বাধীনতা প্রশ্নে যেমন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, একই যুক্তি জাতি ও সমাজের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

এবার পরিবার প্রসঙ্গে আসা যাক। পরিবারকে বলা যেতে পারে মানব সমাজের প্রাচীনতম সংগঠন। ইতিহাসের নানা পর্বে জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র– এইসব যৌথ সংগঠনের জন্ম হলেও পরিবার অদ্যাবধি সচল-সক্রিয় সংগঠন। মূলে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ সদস্যদের একটি গোষ্ঠী হলেও রাষ্ট্রচেতনা, ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, মূল্যবোধ গঠন, সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও জাতি গঠনের ভিত্তিভূমি পরিবার। বলতে গেলে রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজের টিকে থাকার প্রধান অনুঘটক শক্তি পরিবার। কিন্তু পরিবারের স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করতে গেলে উল্লিখিত তিনটি সংগঠনই সাপেক্ষ হিসেবে উপস্থিত হবে। সেই প্রেক্ষাপটে পরিবারের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় প্রতিটি পরিবার তার অভ্যন্তরীণ কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূল্যবোধ নির্ধারণে রাষ্ট্র-সমাজ-জাতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাতন্ত্র্য ও স্বনির্ভরতা বজায় রাখতে পারছে কি না। বলা বাহুল্য, পরিবারের স্বাধীনতা নির্ধারণে রাষ্ট্রের প্রণীত আইন বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার আইনসহ সবকিছুই রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দেয়। আবার মাতৃত্বকালীন ছুটি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, ভর্তুকি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এসব রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিবারের সক্ষমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। কিন্তু এই সহায়তা পরিবারের নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করছে কি না তা রাষ্ট্র ও পরিবারের সমঝোতা ও ভারসাম্যের বিষয়। এই সমঝোতা ও ভারসাম্যই পারিবারিক স্বাধীনতার নির্ণায়ক।

অপরপক্ষে, সমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনীয় নয়, সমাজ পরিচালিত হয় বলতে গেলে অদৃশ্য বিধানে। সমাজ এমন একটি কাঠামো যা প্রবলভাবে সংস্কৃতি, ধর্ম, রীতিনীতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পরিবারকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা রাখে এবং পরিবারের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করতে পারে। এরপরেও পেশা নির্বাচন, নারীর ভূমিকা, সন্তান লালন-পালন, বিবিধ প্রথা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজ সাধারণত পরিবারের ওপর নির্দিষ্ট ধরনের প্রত্যাশা চাপিয়ে দেয়, যা পরিবারের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মক্ষমতার পথে অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পরিবার ও সমাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা ইতিবাচক দিক থাকলেও এই নেতির দিকগুলোও ক্রমাগত পর্যবেক্ষণে রেখে, সংস্কারের মাধ্যমে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে যেতে হয়।

এদিকে জাতি তুলনামূলকভাবে একটি বৃহৎ চেতনার নাম যেখানে ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় মিলেমিশে একটি সমষ্টিগত সত্তা গঠন করে। এই জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক হিসেবে পরিবার কাজ করে। পরিবারেই শিশুরা প্রথম ভাষা শেখে, সংস্কৃতি ও জীবনচর্চা রপ্ত করে, ইতিহাস ও জাতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়। এইভাবেই পরিবার জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তোলে। দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা, নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ এসব গুণ পরিবারের মধ্য দিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে রোপিত হয়। তবে যদি জাতীয়তাবাদ কট্টর ও একদেশদর্শী হয়ে ওঠে তবে স্বভাবতই তা পরিবারের নিজস্বতা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে আক্রান্ত করবে, তার বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। ফলে দেখা যাচ্ছে, পরিবারের স্বাধীনতা রাষ্ট্র, সমাজ ও জাতির সঙ্গে একটি আন্তঃসম্পর্কিত ও আপেক্ষিক ধারণা। একদিকে যেমন রাষ্ট্র পরিবারের কল্যাণ ও সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে তার অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ স্বাধীনতা সংকুচিত করে। সমাজ ও জাতি পরিবারকে মূল্যবোধ ও ঐক্যের শিকড়ে আবদ্ধ রাখলেও, কখনো কখনো রীতিনীতির নামে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, পরিবারের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে নিঃসন্দেহে প্রয়োজন রাষ্ট্র-সমাজ-জাতির মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

পরিশেষে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসঙ্গে আসা যাক। মানব সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতাই স্বাধীনতার চূড়ান্ত মানদণ্ড এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অধিকার ও চর্চার ক্ষেত্র। এটি এমন একটি ধারণা, যার মাধ্যমে মানুষ তার চিন্তা, মতামত, ধর্মাচার, শিক্ষা, পেশা, জীবনের লক্ষ্য এবং সম্পর্কের বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে ব্যক্তি কখনোই একটি বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। সে পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র নামক বহুস্তরিক বৃহত্তর কাঠামোর অন্তর্গত। ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা এই কাঠামোগুলোর নিয়ম, সীমা ও শর্তের মধ্যে নির্ধারিত হয়। পরিবারই প্রথমত সেই বুনিয়াদ তৈরি করে। তবে এই নিরাপদ আশ্রয়স্থলেই স্বাধীনতা অনেক সময় সীমাবদ্ধ হয়। পরিবার ব্যক্তিকে স্বনির্ধারণের সুযোগ দিচ্ছে কি না, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক কাঠামোর বিষয়ে পরিবার কতটা

আদতে ব্যক্তি স্বাধীনতা একটি মৌলিক, কিন্তু আপেক্ষিক ও শর্তাধীন ধারণা। পরিবারে আবেগ ও কর্তব্যের ভারসাম্যে, সমাজে রীতিনীতির প্রেক্ষিতে, জাতির সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিতে এবং রাষ্ট্রের আইন ও শাসনের পরিসরে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা চর্চা করে থাকে। এই স্বাধীনতা যেন বিকশিত হতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন পরিবারের উদারতা, সমাজের সহনশীলতা, জাতির বহুত্ববাদী চেতনা এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক নীতিমালা। তবেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারে চিন্তায়, কর্মে ও চর্চায়।

তাই বাংলাদেশের বিজয় দিবস স্বাধীনতার পথে একটি রাষ্ট্রের অভিযাত্রা সূচনার দিবস। রাষ্ট্র থেকে স্বাধীনতা জাতি, সমাজ, পরিবার হয়ে ব্যক্তির কাছে পৌঁছালেই প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত হবে।

ড. মো. হাবিব জাকারিয়া: অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,

সচেতন, প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব সেখানে আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে কি না, এগুলো অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন। আবার সমাজ সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে সম্মান দান, প্রত্যাখ্যান, সামাজিক চাপ ও ভিন্নমত দমনের অধিকার সংরক্ষণ করে। উত্তরাধুনিক ডিজিটাল সমাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যক্তি স্বাধীনতার এক নতুন ক্ষেত্র খুলে দিয়েছে বটে, তবে হেট স্পিচ, ট্রলিং ও সামাজিক বর্জনের মতো সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। একইভাবে জাতি প্রশ্নে ব্যক্তি স্বাধীনতা জাতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই তা গ্রহণযোগ্য হয়। জাতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সমন্বয় না করে চললে ব্যক্তিকে অবিশ্বস্ত বা 'অপর' হিসেবে দেখা হয়। ধর্ম, ভাষা বা জাতিগত সংখ্যালঘুরা তাদের নিজস্ব পরিচয় রক্ষা করতে গিয়ে জাতীয় ঐক্যের অজুহাতে প্রায়শই বাধার সম্মুখীন হয়। বিশেষত জাতীয়তাবাদের চরমপন্থা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে চরম হুমকির মুখে ফেলতে পারে, বিশেষত ভিন্ন মতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে।

তবে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় রাষ্ট্রের যে ভূমিকা তা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নানাভাবেই শক্তিশালী। বিশেষ করে সম্মতি উৎপাদন ও প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের সক্ষমতা রাষ্ট্রকে জাতি বা ভিন্ন গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদি আইন দিয়ে নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু যখন ব্যক্তি স্বাধীনতা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা 'জাতীয় স্বার্থ'-এর বিরুদ্ধে যায় বলে মনে করা হয়, তখন রাষ্ট্র তা দমন করার অধিকারও রাখে। আবার রাষ্ট্রবিরোধী মতাবলম্বী বা প্রতিবাদকারী নাগরিকদের বিরুদ্ধে দমনপীড়নের পথেও যায়, যা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থি।

ঢাকা থেকে খুলনা ও বেনাপোল রুটের নতুন ট্রেন

ঢাকা থেকে কাশিয়ানী জংশন হয়ে খুলনা ও বেনাপোলে নতুন দুই জোড়া যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হয় ২৪শে ডিসেম্বর। খুলনা-ঢাকা-খুলনা রুটে 'জাহানাবাদ এক্সপ্রেস' এবং বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল রুটে 'রূপসী বাংলা' এক্সপ্রেস সাপ্তাহিক একদিনের বিরতি রেখে নিয়মিত যাতায়াত করবে। নতুন চালুকৃত দুটি ট্রেনযোগে মাত্র পৌনে চার ঘণ্টায় ঢাকা থেকে খুলনা ও বেনাপোল পৌঁছানো যাবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ট্রেনযোগে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল-ঈশ্বরদী হয়ে খুলনা যেতে সময় লাগে ৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট এবং রাজবাড়ী হয়ে বেনাপোল যেতে ৭ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট অর্থাৎ নতুন চালুকৃত ট্রেনযোগে ঢাকা-খুলনা ও বেনাপোল যাতায়াতে সময় কম লাগবে যথাক্রমে ৫ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ও প্রায় ৪ ঘণ্টা। ২৪শে ডিসেম্বর রেলপথ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ট্রেন দুটির চলাচল উদ্বোধন করেন।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

বিজয় দিবস: ইতিহাস, দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

ড. সুলতানা আক্তার

একটি জাতির ইতিহাসে কিছু দিন থাকে যেগুলো জাতির অস্তিত্ব, আত্মপরিচয় এবং আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের জন্য তেমন একটি দিন হলো ১৬ই ডিসেম্বর– বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। এই দিনটি আমাদের জন্য গর্ব, আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার দিন হলেও এর পাশাপাশি এটিও মনে করিয়ে দেয় আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার। ২০২৪ সালের বিজয় দিবস হচ্ছে আমাদের ৫৪তম বিজয় দিবস। স্বাধীনতার পঞ্চাশোর্ধ্ব বছর পেরিয়ে এসে আমরা যখন বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করি, তখন প্রশ্ন ওঠে আমরা আমাদের বিজয়ের লক্ষ্য কতটা অর্জন করেছি? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা কী বার্তা রেখে যাচ্ছি? বিজয় দিবস আমাদের শুধু অতীতের গৌরব মনে করিয়ে দেয় না, এটি আমাদের বর্তমানকে সজাগ করে এবং ভবিষ্যৎকে আলোকিত করতে পথ দেখায়। এই প্রবন্ধে তাই বিজয় দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আমাদের নাগরিক দায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই দিবসের গুরুত্ব কীভাবে উপস্থাপন করা উচিত– এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিজয় দিবসের পেছনের গৌরবময় ইতিহাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগ। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়, যার দুটি অংশ– পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান– একই রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেও সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন ছিল। শুরুতেই ভাষার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার মানুষ বুঝতে পারে তারা উপেক্ষিত। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ। এর ধারাবাহিকতায় ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অভূতপূর্ব বিজয় আসে।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান এই গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালনা করে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। সেই থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসে ৩০ লক্ষ মানুষ শহিদ হন, ২ লক্ষ মা-বোন নির্যাতিত হন এবং প্রায় ১ কোটি মানুষ শরণার্থী হন প্রতিবেশী ভারতে। এই সমস্ত ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর আসে বিজয়ের জয়ধ্বনি নিয়ে।

বিজয় দিবসের তাৎপর্য

বিজয় দিবস শুধু একটি তারিখ নয়, এটি বাঙালি জাতির জন্য একটি গৌরবময় অধ্যায়। এটি আমাদের পরিচয়ের ভিত্তি এবং জাতিগত চেতনার উৎস। এ দিবস মনে করিয়ে দেয়– স্বাধীনতা সহজে আসে না, এটি অর্জিত হয় অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে। এই দিবস আমাদের আত্মসমালোচনার সুযোগ করে দেয়। আমরা প্রশ্ন করি– আমরা কি প্রকৃত অর্থে সেই আত্মত্যাগের মর্যাদা দিতে পারছি? আমরা কি আমাদের বিজয়কে অর্থবহ করে তুলেছি? এসব প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়েই আমরা উপলব্ধি করি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৫৪তম বিজয় দিবস: আত্মসমালোচনার সময়

২০২৪ সালে আমরা ৫৪তম বিজয় দিবস পালন করছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ অনেকক্ষেত্রেই উন্নতি করেছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, প্রযুক্তিতে উন্নয়ন ইত্যাদি আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সাক্ষ্য। তবে একই সাথে প্রশ্নও ওঠে–

- ❑ আমরা কি শহিদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পেরেছি?
- ❑ দেশে এখনো দারিদ্র্য, বৈষম্য, দুর্নীতি, রাজনৈতিক সংকট বিদ্যমান কেন?
- ❑ আমাদের শিক্ষা ও মূল্যবোধের অবস্থা কেমন?
- ❑ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেমন সমাজ পাবে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায়িত্ব আজ আমাদের। বিজয় দিবস যেন কেবল আনুষ্ঠানিকতা না হয়ে যায়, সেটাই নিশ্চিত করতে হবে।

স্বাধীনতা রক্ষায় নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব

একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয় সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা এবং তা অর্থবহ করে তোলা। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে–

১. সঠিক ইতিহাস জানা ও ছড়িয়ে দেওয়া

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা অনেক সময় হয়েছে, আজও হচ্ছে। তাই আমাদের দায়িত্ব, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস শেখানো। পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে শোনা গল্প, ডকুমেন্টারি, চলচ্চিত্র, গ্রন্থ প্রভৃতির মাধ্যমে ইতিহাস তুলে ধরতে হবে।

২. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন

স্বাধীনতা শুধু ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির নামও বটে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার না হলে একটি জাতির উন্নয়ন থেমে যায়। তাই প্রতিটি মানুষকে সৎ, ন্যায়ের পথে থাকা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৩. গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

একটি দেশের স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন সকল নাগরিক সমান সুযোগ পায় এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করে। তাই গণতন্ত্র চর্চা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করাই একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ।

৪. সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বজায় রাখা

বিজয়ের চেতনা মানে সব ধর্ম, বর্ণ ও জাতির জন্য সমান অধিকার ও মর্যাদা। সমাজে সম্প্রীতি, মানবিকতা এবং সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করাও স্বাধীনতা রক্ষার অংশ।

৫. প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন

আজকের বিশ্ব প্রতিযোগিতার। তাই আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকেও সমান মনোযোগ দিতে হবে। স্বাধীনতা তখনই সার্থক হবে, যখন জাতি বৈশ্বিক মঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও বিজয় দিবস

আজকের শিশু-কিশোররাই আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার কারিগর। তাই বিজয় দিবসকে কেবল ছুটি বা আনুষ্ঠানিকতা নয়, তাদের মনে এটি একটি গভীর চেতনার উৎস হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

১. ইতিহাসকে জীবন্ত করে উপস্থাপন

শুধু বইয়ের পাতা নয়, ডিজিটাল মিডিয়া, থিয়েটার, VR (ভার্চুয়াল রিয়ালিটি), চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন এবং গেমের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ

ও বিজয়ের গল্প তুলে ধরলে তরুণদের আগ্রহ বাড়বে এবং তারা ইতিহাসের সঙ্গে আবেগের বন্ধনে যুক্ত হবে।

২. তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে বিজয়ের প্রেরণা

বিজয়ের গল্পে তরুণদের অবদান অনস্বীকার্য। আজও সেই চেতনায় তরুণরা নেতৃত্বে আসুক— দেশ গঠনে, উদ্ভাবনে, গবেষণায় ও সমাজসেবায়। এজন্য শিক্ষায় সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব গুণ এবং মূল্যবোধ জোর দিয়ে শেখাতে হবে।

৩. বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে ছাত্রদের সরাসরি সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে চিন্তার মাধ্যমে, বাধ্যতামূলক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে নয়।

৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহার

তরুণদের বড়ো একটি অংশ সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয়। সেখানেই বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা, শহিদদের গল্প জানানো, অনুপ্রেরণামূলক কনটেন্ট তৈরি ও ছড়িয়ে দেওয়া গেলে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনেক বেশি প্রভাবিত করবে।

চেতনার পতাকা তরুণদের হাতে তুলে দেওয়া

স্বাধীনতা অর্জনের পথ ছিল রক্তাক্ত, কিন্তু স্বাধীনতা ধরে রাখার পথও সহজ নয়। সেটি নির্ভর করে বর্তমান প্রজন্মের সচেতনতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা কী শিক্ষা দিচ্ছি তার ওপর। একটি সচেতন জাতি গড়তে হলে শিশু-কিশোরদের ছোটোবেলা থেকেই সঠিক ইতিহাস, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেম শেখাতে হবে। আজকের শিশুরা যদি তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগ সম্পর্কে জানে, তাহলে তারাও নিজেদের জন্য নয়, দেশের জন্য ভাবতে শিখবে। বিজয়ের চেতনা হবে তাদের প্রতিটি কাজের চালিকাশক্তি।

বিজয় দিবস আমাদের অহংকার, আমাদের আত্মপরিচয়ের উৎস। এই বিজয় এসেছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় সাহস, শহিদদের আত্মত্যাগ ও সাধারণ মানুষের অসীম ত্যাগের বিনিময়ে। আজ আমাদের দায়িত্ব এই বিজয়ের মূল্য বোঝা, তা রক্ষা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই চেতনা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া।

স্বাধীনতা ধরে রাখতে হলে শুধু বাহ্যিক শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, অভ্যন্তরীণ শত্রু– দুর্নীতি, বৈষম্য, অজ্ঞতা, নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে। তাহলেই আমরা বিজয় দিবসকে যথার্থভাবে সম্মান জানাতে পারব। ৫৩ বছর আগে যে বিজয় আমরা অর্জন করেছি তা কেবল যুদ্ধের ময়দানে নয়, বরং চিন্তায়, চেতনায়, কর্মে এবং নৈতিকতায়ও অর্জন করতে হবে প্রতিনিয়ত। এই চেতনায় গড়ে উঠুক একটি সুশৃঙ্খল, উন্নত ও মানবিক বাংলাদেশ, যেখানে বিজয়ের পতাকা শুধু মাটিতে নয়, থাকবে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে, কর্মে ও চেতনায়। এই ৫৪তম বিজয় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক– এই বিজয় শুধু অতীতের গর্ব নয়, ভবিষ্যতের পথনির্দেশ।

ড. সুলতানা আক্তার: অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, sultana@juniv.edu

স্বৈরাচার মুক্ত স্বদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মহান বিজয় দিবস পালন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ও বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক **ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী** বলেন, 'জাতি এবার স্বৈরাচারমুক্ত পরিবেশে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করতে পেরেছে। নিকট অতীতে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এং মহান বিজয় দিবসকে দলীয় আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করা হয়েছিল। ফলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব জাতীয় দিবস পালন করতে পারেনি। জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো পালনের নামে ব্যক্তি বিশেষের প্রচারণা চালানো হয়েছে। এজন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এসব অনুষ্ঠানে তেমন একটা সম্পৃক্ত হয়নি।' ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী *সচিত্র বাংলাদেশের* জন্য দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, এখন উদার গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন *সচিত্র বাংলাদেশের* নিয়মিত লেখক এম এ খালেক। সাক্ষাৎকারের বিবরণ উল্লেখ করা হলো:

সচিত্র বাংলাদেশ: আপনি তো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কী পরিপ্রেক্ষিত ?

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী: ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। সেই সময় আমি সূর্যসেন হলের একটি কোয়ার্টারে বসবাস করছিলাম। মার্চ মাসের মাঝামাঝি অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আমি নিজ শহর ফেনীতে চলে যাই। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের বেলা পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্মম হত্যাকাণ্ড শুরু করলে বাংলাদেশের মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ২৬শে মার্চ কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ২৭শে মার্চ সেই ভাষণই কিছুটা পরিবর্তিত আকারে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে পুনরায় ঘোষণা করা হয়। মেজর জিয়ার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার পর আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত হই এবং মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। সেই সময় রেডিও'তে ঘোষণা করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে। আমাদেরকে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকি। তখন শুভাকাঙ্ক্ষীরা পরামর্শ দিলেন, এই মুহূর্তে আমি যদি কর্মস্থলে যোগদান না করি তাহলে আমার তো বিপদ হবেই পুরো পরিবার ঝুঁকির মুখে পড়বে। আমি শেষ পর্যন্ত কর্মস্থলে যোগদান করি। একদিন পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের বাসায় হামলা করে আমাদের না পেয়ে তারা বাবুর্চি ছেলেটিকে মারধর করে। আমি ডাকযোগে জীবননাশের হুমকি সংবলিত একটি চিঠি পাই। যমদূত বাহিনীর চিঠি পাবার পর আমি ঢাকা শহর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি ৩১শে মে সীমান্ত পাড়ি দেবার মানসে রাজধানী ত্যাগ করি।

কিছুদিন আগরতলায় অবস্থান করার পর আমি কোলকাতা গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর পরিসরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া। কোলকাতা পৌঁছানোর পর আমরা কয়েক জন মিলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠনের কাজে নিয়োজিত হই। বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার চেষ্টা করি। পরবর্তীতে দেশ

স্বাধীন হবার পর নানা সংকট পেরিয়ে ১৯৭২ সালের ৫ই জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করি।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি এবং যুদ্ধ শেষে অক্ষত অবস্থায় দেশে ফিরে আসি। আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত শক্ত মনের একজন মানুষ। তাকে আমি জীবনে মাত্র তিনবার কাঁদতে দেখেছি। একবার দাদির মৃত্যুর পর, দ্বিতীয়বার আমি যখন বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দেই এবং শেষবার আমি যখন মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসি।

সচিত্র বাংলাদেশ: মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর দেশের অবস্থা কেমন দেখলেন? আপনি যে আশা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তা কি পূরণ হয়েছে?

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী: মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে-কোনো মূল্যেই হোক দেশের সেবা করব। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করব। মানবিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সত্যিকারার্থে একটি উদার গণতান্ত্রিক এবং কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করব। কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হতে বিলম্ব হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনো একক দলের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়নি। সব দল-মতের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছিল। এটা ছিল মূলত জনযুদ্ধ। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। অথচ সেই সময় জাতীয় সরকার গঠন করে সম্মিলিতভাবে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই ছিল জরুরি। জাতীয় সরকার গঠিত হলে সম্মিলিতভাবে দেশের পুনর্গঠনে কাজ করা সম্ভব হতো। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের এক শ্রেণির নেতা-কর্মী দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির মাধ্যমে দেশে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো কোনোটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত হয়। সরকারি দলের লোকদের নির্বিচার লুটপাটের কারণে ১৯৭৪ সালে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। লাখ লাখ মানুষ খাদ্যাভাবে মারা যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পেছনে খাদ্যের স্বল্পতা যতটা না দায়ী ছিল তার চেয়ে বেশি দায়ী ছিল খাদ্য সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছাতে না পারা। সরকার দলীয় এক শ্রেণির ব্যবসায়ী সেই সময় দেশের বাইরে খাদ্য পাচার করেছিল। সরকারি দলের এক শ্রেণির নেতা-কর্মীর ব্যাপক লুটপাটের কারণে দেশে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এমনি এক অবস্থায় আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। সেনা বাহিনীর একটি বিক্ষুব্ধ অংশের হাতে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হন।

সচিত্র বাংলাদেশ: এ বছর মুক্ত পরিবেশে বিজয় দিবস পালন করা হচ্ছে। আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। গত ১৬ বছর দেশের মানুষ অনেকটাই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার বলে কিছু ছিল না। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস অনুষ্ঠান পালন করতে পারেনি। মানুষ এক ধরনের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। মূলত সরকারি দলের উদ্যোগেই এসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সেখানে তেমন একটা ছিল না। কিন্তু এবার জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পর মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত পরিবেশে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে পেরেছে। এবার বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান শুধু সরকারি আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটা সর্বজনীন আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান আনন্দঘন পরিবেশে পালিত হয়েছে।

সচিত্র বাংলাদেশ: স্বাধীনতা যুদ্ধ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠন এবং অর্থনীতি থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমরা কতটা সক্ষম হয়েছি বলে মনে করেন?

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী: ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করেছিল পাকিস্তানের আওতায় তারা ন্যায্য অধিকার নিয়ে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারবে। কিন্তু তাদের আশাহত হতে বেশি বিলম্ব হয়নি। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে প্রথম পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, যা রক্তের বিনিময়ে সমাপ্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ নানা প্রক্রিয়ায় নিয়ে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয়িত হতে থাকে। অধিকাংশ কলকারখানাই স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' শীর্ষক যে নির্বাচনি পোস্টার প্রকাশিত হয় তাতে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। মানুষ প্রত্যাশা করেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে তারা ন্যায্য অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আওয়ামী লীগ

সরকার আমলে। জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়েছে। এখন এমন একটি নির্বাচনি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করতে না পারে, জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করতে না পারে। পাকিস্তান আমলে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার, মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, স্বাধীন দেশেও আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য জীবন দিতে হচ্ছে। পাকিস্তান আমলে আমরা যে ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছিলাম এখনও তেমন বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার সফল আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক, মানব কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সেই সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের এমন একটি নির্বাচনি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে যেখানে কোনো রাজনৈতিক দল বা সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সাধারণ মানুষ তাদের ইচ্ছেমতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নেতা নির্বাচন করতে পারবে।

গত সরকরের আমলে দেশের বিদ্যমান অবস্থায় সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার ছিল না। তারা এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে বসবাস করছিল। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশ্ন করতেই পারি, তাহলে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম কেন? আমরা তো গণবিরোধী এক শাসকের পরিবর্তে আর এক শাসককে ক্ষমতায় বসানোর জন্য যুদ্ধ করিনি। গত ১৬ বছরে আমরা দেশে নিকৃষ্ট, ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। যেখানে মানুষের কোনো মর্যাদা ছিল না। আইন-বিচার ব্যবস্থাসহ সব প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণের মাধ্যমে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ আবারও মুক্তপরিবেশে প্রবেশ করেছে। এখন এই সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে। নতুন পরিবেশে মানুষ তাদের হৃত অধিকার ফিরে পাবে– এটাই প্রত্যাশা।

সচিত্র বাংলাদেশ: *দেশের* শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান কমে যাচ্ছে বলে অনেকেই অভিযোগ করেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী: স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষার সকল স্তরে মানের অবনতি শুরু হয়, যা এখনো চলমান রয়েছে। সত্তরের দশকে সর্বস্তরে বাংলা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ আমরা জোগান দিতে পারিনি। বাংলা একাডেমি বিদেশি ভাষায় রচিত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশের পরিকল্পনা নিলেও তা সফল হয়নি। সর্বস্তরে বাংলা চালুর উদ্দেশ্য বিদেশি ভাষাকে উপেক্ষা করা নয়। কিন্তু আমাদের এখানে কার্যত সেটাই হয়েছে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর কার্যক্রম ঘোষণা করা হলে অনেকেই মনে করেছিলেন এখন আর ইংরেজি ভাষা শিক্ষার তেমন একটা প্রয়োজন নেই। ফলে স্বাধীনতা-পরবর্তী জেনারেশন ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তার ফল আমরা এখনো ভোগ করে চলেছি। বিগত সাড়ে ১৫ বছরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যোগ্যতা এবং দক্ষতার পরিবর্তে শুধু দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা গবেষণা বা শিক্ষার মানোন্নয়নের চেয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের তোষামোদ করতেই ব্যস্ত থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রমের ওপর তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। ফলে অনেকেই গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন না। ইউনেস্কোর মতে, কোনো দেশের শিক্ষা খাতে জিডিপি'র অন্তত ৬ শতাংশ বরাদ্দ থাকা দরকার। এই অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গবেষণা কাজে ব্যয় করতে হবে। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে যে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় তা জিডিপি'র ২ শতাংশেরও কম। বরাদ্দকৃত এই বেশির ভাগই ব্যয়িত হয় অবকাঠামো নির্মাণকাজে। ফলে গবেষণার জন্য অর্থ পাওয়া যায় খুবই কম। আমি মনে করি, একবারে না হলেও শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ দ্রুত বাড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ। আমাদের এখনই শিক্ষা খাতের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য নয়, যোগ্যতাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা-গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক উন্মোচন করতে হবে। বাংলাদেশ যেহেতু অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দেশ তাই কর্মমুখী শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। একজন শিক্ষার্থী বিদ্যার্জন শেষে যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

সচিত্র বাংলাদেশ: জুলাই-আগস্ট বিপ্লবকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী: জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশ থেকে চলে যাবার ঘটনাটি স্বৈরাচারবিরোধী একটি সফল আন্দোলন, সফল গণ-অভ্যুত্থান। জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলন আমাদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যুগ যুগ ধরে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে জুলাই-আগস্টের ঘটনাপ্রবাহ প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। জুলাই-আগস্ট আন্দোলন ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত একটি সফল বিপ্লব।

সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এমন একটি রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যারা সাম্প্রতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট গণ-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এক নদী রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি মানবিক সমাজ গঠন করা যেখানে কোনো ধরনের বৈষম্য থাকবে না। জুলাই-আগস্ট বিপ্লব আমাদের সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। এখন সুযোগটি সঠিকভাবে কাজে লাগানোর দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কোনো কারণে এখানে ব্যর্থ হবার সুযোগ নেই।

নতুন বাংলাদেশে বিজয় দিবস

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল দিন। যেদিন এক দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ ৫৩ বছর পর এবার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও বিশেষ পরিস্থিতিতে ফিরে এসেছে নতুন বাংলাদেশের দ্বারে উল্লাসে কাঁপা মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে দখলদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে এই ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ৯ মাসে তারা হত্যা করেছিল এ দেশের লাখ লাখ মানুষকে। নির্যাতন ও লাঞ্ছনার কোপানলে নিষ্পেষিত করেছিল অসংখ্য মা-বোনকে। মহান বিজয় দিবসের ক্ষণে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করছি সকল আত্মদানকারী বীর শহিদদের ও তাঁদের রক্তরাঙা বীরত্বগাথায় মোড়ানো স্বর্ণালি ইতিহাসকে।

বাঙালি জাতি এই দিনের বিজয়ের সূত্রেই বীর জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এই দিনেই বাঙালির স্বাধীন জাতি হিসেবে জয়যাত্রা শুরু। এই দিনটির মাধ্যমেই আমরা নতুন প্রজন্মকে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়কে বার বার স্মরণ করিয়ে দেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা, আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা, শহিদদের কথা; মনে করিয়ে দেই বাংলাদেশ নামক একটি দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা; যা প্রতিটি বাঙালি তার হৃদয়ে ধারণ করে আছে। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে ১৬ই ডিসেম্বর গভীর তাৎপর্য বহন করে।

এই বিজয়ের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা; যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিক সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার ভোগ করবে। যেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সব আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য হবে। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু স্বাধীনতার যে মূল প্রত্যয়, সেই গণতন্ত্রকে আমরা সুসংহত করতে পারিনি। অবশেষে ছাত্র-তরুণ-জনতার অসম সাহসী আন্দোলন ও রক্তদানের মধ্য দিয়ে জাতির সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তির প্রত্যাশা আসে বিগত ৫ই আগস্ট। ওই দিন স্বৈরাচারী সরকারপ্রধান পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। জাতি মুক্তি পায় ঘাড়ে চেপে বসা জগদ্দল পাথরসম

ফ্যাসিবাদ সরকারের হাত থেকে। নতুনরূপে আমরা বাংলাদেশকে ফিরে পাই। অধিকাংশ দেশবাসী জুলাই গণবিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত এই বিজয়কে দেশের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' হিসেবেও অভিহিত করেন। তাই এবারের বিজয় দিবস আমাদের সামনে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছে। এ নবদিগন্তে দাঁড়িয়ে আমরা যখন বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করছি, তখন জাতির নেতৃত্বে রয়েছেন ছাত্র-জনতার সমর্থিত ও নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের গতি ধারণ করে অন্তর্বর্তী সরকার সংবিধান, নির্বাচন, জনপ্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ ও দুর্নীতিদমন সংস্কার কমিশন গঠন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই সংস্কার কাজকে ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজন সর্বমহলের সর্বাত্মক সহযোগিতা। রাজনৈতিক দলগুলোও দাবি তুলেছে দ্রুত সংস্কার করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে।

গণতন্ত্রমনা জনগণের প্রত্যাশা– এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাগুলোর সঙ্গে জুলাই বিপ্লবের চেতনা যুক্ত করে বাংলাদেশকে একটি উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান, আইনকানুন প্রবর্তন করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশকে গণতন্ত্রের ধারায় ফিরিয়ে আনবে।

বাংলাদেশের নবযাত্রায় জাতি বাধাহীনভাবে নতুন উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে দিনটি পালন করছে। ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লবের মতো ১৯৭১ সালেও দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের আপামর জনতা স্বাধীনতা-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বৈরশাসককে ক্ষমতাচ্যুত করতে গিয়ে শত শত ছাত্র-জনতা শাহাদতবরণ করেছে, সাত শতাধিক মানুষ চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, অনেকে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুইয়েছে, কমপক্ষে ২৪ হাজার মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়েছে, বিপুলসংখ্যক মানুষকে জোরপূর্বক গুমের শিকার হতে হয়েছে, অনেক আহত মানুষ এখনও হাসপাতালের বিছানায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন এবং অনেকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কালাতিপাত করছেন।

বিজয় দিবসের প্রকৃত অর্থ শুধু শত্রুর পরাজয় নয়, বরং দেশের মানুষের আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতার শপথ এবং সাম্প্রতিক সময়ে দেশে যে চ্যালেঞ্জগুলো সামনে আসছে, তার মোকাবিলার অঙ্গীকার। এটি অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে মুক্তির প্রতীক, যা আজ ২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে এই চেতনা একটি ভিন্ন মাত্রা ধারণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাই ছিল বৈষম্যহীন, শোষণহীন ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায়বিচার কায়েম করা। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানবিক

দেশ গড়ে তোলা। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমিয়ে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে অগ্রাধিকার প্রদান করা। গ্রামীণ জনপদের মানুষদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং বৈষম্যহীন একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। সবাইকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার আওতায় নিয়ে আসা। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। দল-মত নির্বিশেষে সবার মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা। মানব অধিকার সংরক্ষণ করা। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শোষণহীন মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

বর্তমানের বৈষম্যবিহীন নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নের সাথে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের স্বপ্নের কোনো অমিল নেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথেও কোথাও কোনো পার্থক্য নেই। ১৯৭১ সালে পাক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জাতি যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তা বাঙালি জাতির ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এজন্য মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে বিভক্ত নয় ঐক্যবদ্ধ করেছে, অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে একসাথে এগিয়ে চলতে শিখিয়েছে। যে স্বপ্ন ১৯৭১ সালে মানুষ দেখেছিল। স্বপ্ন পূরণ না হলে কিংবা স্বপ্ন ভেঙে গেলে মানুষ আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখে, নতুনভাবে জেগে ওঠে। আগের স্বপ্নকে ধারণ করে নতুন স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যায়। ২০২৪ সালের যে স্বপ্ন তা মুক্তিযুদ্ধেরই স্বপ্ন, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন।

এবারের বিজয় দিবস একেবারে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের দ্বারে উপনীত। জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে যে নতুন বাংলাদেশ দেখার আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছে তা এবারের বিজয়ের ক্ষণে ভিন্ন মাত্রা পাবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এক মোহনায় এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। এটাই এবারের বিজয় দিবসের প্রত্যাশা।

আমাদের যুবসমাজ, আমাদের তরুণ প্রজন্ম আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে অপরিমেয় সম্ভাবনা, তারুণ্যের অসম সাহসী শক্তি, আদর্শবান জাতি গঠনে ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। এই প্রজন্মের কাঁধে আমাদের দেশের উন্নয়নের ভার, আর তাদের হাত ধরে আমরা যেতে চাই নতুন এক বাংলাদেশের হৃদয়মাঠে, এক স্বপ্নময় নবদিগন্তে।

এই বিজয়ের দিনে আমরা সবাই মিলে ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি দুর্নীতিমুক্ত, শোষণহীন ও বৈষম্যহীন দেশ গড়তে এবং মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখি। দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও আধুনিকতার পথে শীর্ষচূড়ায় এগিয়ে নিয়ে যাই। গড়ে তুলি মানবিক, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী এক নতুন বাংলাদেশ।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক, dr.alim1978@gmail.com

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিঃ উৎস ও সহায়ক নীতি

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

বাংলাদেশের অর্থনীতি চলে স্বমহান গতিতে, একটি আন্তঃসহায়ক সলিলা শক্তির (রেজিলিয়েন্ট পাওয়ার) বলে, শত সহস্র কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী আমজনতার নিরলস পরিশ্রমের ফসলে ঋদ্ধ হয়ে। একটা দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, পুঁজি ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবাজাত দ্রব্য উৎপাদন করা যায় টাকার অংকে তার হিসাবকে বোঝায়। আর জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ঐ উৎপাদন গত বছরের তুলনায় এ বছর কী হারে বাড়ছে তার পরিমাণ বোঝায়। জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি সংঘঠিত হয় শ্রমশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পুঁজি সঞ্চয় (ভৌত ও মানব), প্রযুক্তির পরিবর্তন ইত্যাদির অবদানের কারণে আর এগুলোকে বলে উৎপাদনের উপকরণ বা ফেকটরস অব প্রডাকশন। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে অর্থাৎ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি ঘটলে মানুষের কর্মসংস্থান, আয় এবং জীবনকুশলতা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা বাড়ে এবং একই সাথে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আবার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটায়। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে জিডিপি'র অগ্রগতি সাধিত হয় বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে জীবনযাত্রার মান বাড়ার কথা। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থির থাকলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সাপেক্ষে সমাজে সবারই কিছু না কিছু আয় বৃদ্ধি ঘটে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যান্য সব সমস্যার সমাধান করে দেয় যেমন: সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, সুস্থতা, শিক্ষা (খাদ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা) ইত্যাদি। যা কি না আবার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। লক্ষ করতে হবে সবকিছুর ওপর এটা সত্য যে জিনিস বা সম্পদ উৎপাদিত হতে হবে এবং সম্পদ ও সেবা যা উৎপাদিত হবে তাইই জিডিপি হিসাবায়নের জন্য জরুরি। টাকা থাকলে বাঘের চোখ কেনা যায় বটে কিন্তু টাকা থাকলেই যে উন্নয়ন চোখে দেখা যাবে এমন কোনো কথা নেই। পণ্য ও সেবা উৎপাদন ব্যতিরেকে টাকা উপার্জিত হলে সে মওকা টাকা জিডিপি'র উপাদান হিসাবে কিংবা জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে কোনো অবদান হিসেবে হিসাব কষার কোনো সুযোগ নেই। রাজশাহীর আলু উৎপাদনকারী জিডিপিতে সরাসরি অবদান রাখেন যখন ১ কেজি আলু ৬ টাকা দামে বিক্রি করেন পাইকারের কাছে। এখানে জিডিপিতে ১ কেজি আলুর উৎপাদন ৬ টাকায় স্বীকৃত হয় কিন্তু এই আলু ঢাকায় আসার পথে চাঁদাবাজি বাবদ কেজিপ্রতি ১৫ টাকা অতিরিক্ত চাঁদবাজি ও আদায়সূত্রে অর্জন করলে সে টাকা জিডিপি'র হিসাবে আসবে না, কেননা অতিরিক্ত এ টাকা দ্বারা অতিরিক্ত কোনো সম্পদ তৈরি হয়নি। এটি অর্জিত হয়েছে কোনো বিনিয়োগ ছাড়াই। এ অর্থ উপার্জন জিডিপি পদবাচ্য নয়। বরং এই ১৬ টাকা অপব্যবহৃত হয়ে অর্থনীতিকে অনুৎপাদনশীল খাত অপব্যয়িত হয়ে দেশ ও সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে কেননা এই ১৬ টাকা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টির কাজে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়ে সমাজে নির্ধারিত আয়ের মানুষের জন্য জীবনযাপনকে দুর্বিষহ করে তোলে। সমাজে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থায় বৈষম্য সৃষ্টি করে। ২৫ কোটি টাকায় একটি সেতু নির্মাণ প্রাক্কলন করে প্রকৃত ব্যয় ৬৫ কোটি টাকায় উন্নীত হলে ৪০ কোটি

টাকার বর্ধিত ব্যয় জিডিপি'র হিসাবে ধর্তব্য হবে না এজন্যে সেতু তো সেই একটিই পাওয়া গিয়েছে। বাড়তি ৪০ কোটি টাকা দিয়ে একাধিক সেতু তো তৈরি হয়নি। সুতরাং প্রকৃত সম্পদ ও সেবা সৃষ্টি ব্যতিরেকে এডিপি'র বিশাল ব্যয় জিডিপি'র বপুতে টাকার অংকে যোগ করার সুযোগ থাকতে নেই। কর্মচারীকে বেতন দেওয়া হয় কাজের বিনিময়ে অর্থাৎ তার দ্বারা সম্পদ ও সেবা সৃষ্টির বিপরীতে এই ব্যয়। কিন্তু তাকে দিয়ে কোনো কাজ না করিয়ে তাকে বসিয়ে বসিয়ে যদি বেতন দেওয়া হয় তাহলে কোনো গুডস অ্যান্ড সার্ভিস উৎপাদন ব্যতিরেকেই তার পেছনে অর্থ ব্যয় করা হবে। এই টাকা জিডিপি'র শরীরে অপাঙ্‌ক্তেয়। সুতরাং সম্পদ ও সেবা উৎপাদনই বড়ো কথা জিডিপি'র হিসাবায়নে। ৩৫০০০ ইলিশ মাছের দাম ৭ কোটি টাকা। এই দাম ১৪ কোটি টাকা হলে কোনো উপকার নেই যদি আর ৩৫০০০ অতিরিক্ত ইলিশ উৎপাদিত না হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে প্রকৃত উৎপাদন, ক্রয় ক্ষমতা, চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয় না হলে খামোখা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জিডিপি'র জন্য দুঃসংবাদ, অর্থনীতির পুষ্টিহীনতার লক্ষণ । উন্নয়নের জন্য অবশ্য আয় বৃদ্ধি দরকার হবে যদিও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটলেই জনগণের উন্নয়ন ঘটবে এটা নিশ্চিত নয়; আর এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি উন্নয়নের দরকারি শর্ত পূরণ করে, যথেষ্ট শর্ত পূরণ করে না। আয় বৃদ্ধি ঘটলে অমরত্ব না হলেও অন্তত রোগ-শোক, দুর্দিন-দুশ্চিন্তা মুক্ত অপেক্ষাকৃত একটা দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কিন্তু এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই দীর্ঘ জীবন কত দীর্ঘ? অনুমান করা যেতে পারে গড়পড়তা ৭০-৭৫ বছর বাঁচতে পারাটা স্বস্তিদায়ক, ৭৫-৮০ বছর টিকে গেলে আরও বেশি ভালো এবং ৮০ বছর-এর ওপর বাঁচতে পারলে তো কোনো কথাই নেই। তবে দেখার দরকার হবে সময়ের বিবর্তনে মাথাপিছু আয় বাড়ার সাথে সাথে মানুষের আয়ু বাড়ছে কি না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৮২০ সালে ভারতে গড় আয়ু ছিল ২১ বছর এবং যুক্তরাজ্যে ৪০ বছর, কিন্তু ১০০ বছরের ব্যবধানে ভারতে গড় আয়ু মাত্র ৩ বছর বেড়ে দাঁড়ায় ২৪ বছর আর একই সময়ে যুক্তরাজ্যে ১০ বছর আয় বেড়ে ৫০ বছরে পৌঁছে; তারও প্রায় ১০০ বছর পর (১৯৯৯) ভারতে প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ৬০ বছর এবং যুক্তরাজ্যে ৭৭ বছর এবং বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ু ১৯৮১ সালে ছিল প্রায় ৫৫ বছর আর ২০১০ সালে প্রায় ৬৮ বছর।

সুতরাং অমর্ত্য সেন যেমনটি বলেছেন– 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মাথাপিছু আয়কে গৌরবান্বিত করে কিন্তু এ প্রক্রিয়া আয়ের বিতরণ, বিন্যাস ও মাত্রাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না'। মোটা হওয়া মানে বলবান হওয়া নয়। আবার অনেকে আয় শূন্য অবস্থায় তলানিতে পড়ে থাকলেও কিছু লোকের পর্বত-প্রমাণ আয় বৃদ্ধি মাথাপিছু গড় আয় ওপরের দিকে ঠেলে দিতে পারে যেমন: কারো আয় বৃদ্ধি ঘটাতে পারে ২০০-৩০০ শতাংশ হারে; কারো ১-২ শতাংশ হারে এবং এভাবেই সমাজে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে বৈষম্য প্রকট হতে পারে। একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাক, বাংলাদেশে ১৯৭৩/১৯৭৪ সালে গড়পড়তা মাথাপিছু আয় ছিল ১০০-১৫০ ডলার এবং সেই সময় বৈষম্য নির্দেশক গিনি সহগ ছিল বড়োজোর ০.৩৫ অথচ মাথাপিছু আয় যখন ৯৮৩ ডলার দাঁড়ায় তখন কিন্তু গিনি সহগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৭; ২০২০ সাওে মাথাপিছু আয় ২০১০ ডলার, গিনি সহগ ?। সবার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ধনীর বেড়েছে গরিবের চেয়ে অনেক বেশি হারে অর্থাৎ সময়ের বিবর্তনে বেড়েছে বৈষম্য। কথা হচ্ছে, অর্থনৈতিক বৈষম্যেও প্রধান সমস্য হলো বৈষম্যের স্তর বড়ো থাকলে প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য হ্রাস সংক্রান্ত প্রভাবটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একটা অপেক্ষাকৃত সাম্যবাদী সমাজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যতটুকু দারিদ্র্য হ্রাস করাতে পারে, একটা বৈষম্যমূলক সমাজে তাঁর চেয়ে অনেক কম গতিতে দারিদ্র্য হ্রাস ঘটায়। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ বা অর্থনীতি আছে (যেমন: ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা) সেখানে প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেশি কিন্তু তার বিন্যাস এতটাই বেদনাদায়ক এবং নির্মম যে মনে হবে ওই দেশগুলোতে দারিদ্র্য প্রবৃদ্ধিকে উপহাস করছে।

প্রবৃদ্ধি বাড়লে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটতে পারে কিন্তু প্রবৃদ্ধি ঘটা মানেই উন্নয়ন নয় এবং উন্নয়ন যেখানে আছে সেখানে অবশ্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটেছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটেছে বলেই সেখানে উন্নয়ন ঘটেছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। অপেক্ষাকৃত সাম্যমূলক নীতি গ্রহণ ব্যতিরেকে বস্তুত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন এক সাথে পাওয়া যাবে না। উন্নয়ন ডিসকোর্সে মানুষের 'স্বত্বাধিকার' ও সেই স্বত্বাধিকার থেকে পাওয়া সক্ষমতার দিকে নজর দেওয়া জরুরি। অমর্ত্য সেন যেমনটি উপলব্ধি করেন– 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টি; মানুষ কী করতে পারছে, কী পারছে না, সেটাই উন্নয়ন তত্ত্বের আলোচ্য হওয়ার কথা। মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করছে? অকালমৃত্যুকে জয় করতে পারছে? তার কি যথেষ্ট পুষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে? সে কি লিখতে পড়তে, পরস্পর চিন্তার আদান-প্রদান করতে শিখেছে? সাহিত্যচর্চায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পারঙ্গম হয়েছে? ... মানুষের সক্ষমতা প্রসারের প্রক্রিয়াটিই আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন' (সেন ১৪০৫ বাংলা)।

এটা ঠিক বাংলাদেশের পরিসংখ্যান দপ্তর গত অর্ধযুগ ধরে মোটা দাগের পাঁচ পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নেই আছে কীভাবে জিডিপির প্রবৃদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করা যায়, হিসাবায়ন পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করা যায়। ২০১৯-২০২০ -এর এডিপিতেই ছিল এসব প্রকল্প- (১) ডাটা কনভার্সন, মেটা ডাটা প্রিপারেশন অ্যান্ড টাইম সিরিজ ডাটা কম্পাইলেশন , (২) সার্ভেইস অ্যান্ড স্টাডিস রিলেটিং টু জিডিপি রিবেসিং ২০১৫-১৬ , (৩) ইমপ্রুভিং অব জিডিপি কম্পাইলেশন অ্যান্ড রিবেসিং অব ইনডিসেস প্রজেক্ট , (৪) ন্যাশনাল স্ট্রেটেজি ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব স্টেটেস্টিকস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট (এনএসডিএস), (৫) মডার্নাইজেশন অব ন্যাশনাল অ্যাকাউনটস স্টাস্টিকস প্রজেক্ট । অন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা প্রথম প্রথম জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করলেও চূড়ান্ত জিডিপি ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস কর্তৃপক্ষ যা দেখায় তাতে আর তাদের না

করার থাকে না। কেননা সংস্থাগুলোর আমলা পরামর্শক কাম বিশেষজ্ঞদের দৌড় ও দ্বারস্থ হতে হয় ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস পর্যন্তই।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ২৯ ভাগ আসে কৃষি ও তদসংশ্লিষ্ট খাত থেকে। সমতল ভূমির মোট জমির শতকরা ৯২ ভাগ ব্যবহার হয় কৃষিকাজে আর কৃষিকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে শতকরা ৬৪ ভাগ মানুষ। কৃষি খাতে দেশের সিংহভাগ ভূমি ব্যবহৃত এবং এ খাতেই কর্মসংস্থানের অন্যতম উৎস। খাদ্য ঘাটতির দেশে দানাদার খাদ্যে এসেছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। কৃষিপণ্যের রপ্তানি ছুঁয়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক। তবে এ সাফল্য কৃষি খাতের প্রারম্ভিক সাফল্য।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ, উচ্চ ফলনশীল শস্যের উৎপাদনে সহায়তাকারী বীজ, উপকরণ, সার ইত্যাদি সরবরাহ, কৃষককে সহজ শর্তে মূলধন জোগান এবং তার উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিপণন ব্যবস্থা তদারকি করে কৃষি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করণের মাধ্যমে কৃষিকেই দেশের জিডিপি'র অন্যতম জোগানদাতা হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। একই সাথে কৃষিনির্ভর শিল্পপ্রতিষ্ঠা এবং কৃষির উন্নয়নকামী পদক্ষেপ; নদীমাতৃক দেশে পানি সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং নদী শাসন ও নৌযোগাযোগ; জনবহুল জনপদের জনশক্তিকে সম্পদে রূপান্তর এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দেশীয় কাঁচামাল এর উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশজ সম্পদের সমাহার ঘটিয়ে উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণে স্থানীয় সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ, ব্যক্তি তথা বেসরকারি খাতের বিকাশ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্ভাবনার বিকাশ ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নের অন্যতম, বাঞ্ছিত ও কাঙ্ক্ষিত উপায়। স্বয়ম্ভর স্বদেশ এবং এর অর্থনীতির ভিত গড়তে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের যৌক্তিকতা ছিল।

কৃষিতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি বাড়াতে হবে। সরকারের নীতি-সহায়তা বৃদ্ধি ও কিছু প্রতিবন্ধকতা দূর করা গেলে কৃষি খাত আরও এগিয়ে যাবে। বিশ্ব কৃষির বাজারে প্রথমসারির দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ৫০০ কোটি টাকার স্ট্যার্টঅ্যাপ বিজনেস ফান্ডের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেসরকারি ব্যাংক এতে সমপরিমাণ অর্থ নিয়ে ১ শতাংশ সুদে সহায়তা দেবে। সে ক্ষেত্রে কৃষি উদ্যোক্তাদের এ ঋণের বড়ো অংশের ব্যবস্থা করা দরকার। এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা। সেজন্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরও এগিয়ে নেওয়ার বিকল্প নেই। দেশে কৃষিশিল্প গড়তে ১ থেকে ২ শতাংশ সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার। পাশাপাশি শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আরও কিছু বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আগামীতে কাজ করতে হবে। দেশে-বিদেশে কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মার্কেট বড়ো না হলে কোনোভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব কৃষিকে রূপান্তর করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে কিছু আইনকানুন বদলাতে হতে পারে। রপ্তানিমুখী অর্থনীতি তৈরির জন্য কৃষিখাতকে এগিয়ে নেওয়ার বিকল্প নেই।

শিল্পনীতি, কৃষিনীতিতে নানা সুযোগ-সুবিধা কীভাবে বাড়ানোর প্রস্তাবে সহায়তা আবশ্যক হবে। এটা উপলব্ধিতে আসতে হবে যে কৃষির উন্নয়ন ছাড়া স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষি খাতে বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের প্রয়োজনে যেসব সুবিধা যেমন– স্বল্প সুদে ঋণ এবং দরিদ্র ও অতিদরিদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ এবং প্রণোদনা সহায়তা বাড়ানো। ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্রদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর আগ্রহ কম। তারা তাদের নির্ধারিত ঋণের বড়ো অংশ বড়ো খাতগুলোকে দিচ্ছে। কৃষিতে কম দিচ্ছে। কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় সবাইকে তারা সহায়তা করুক। সে তাগিদ আগেও ছিল এখনো থাকবে। বাংলাদেশের কৃষক, ভালো কৃষক। তারা উৎপাদনশীলতায় নেদারল্যান্ডসের মতো উন্নত কৃষি উৎপাদনকারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি রপ্তানিতে ১০০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। এ সাফল্য শেষ নয়, শুরু। সরকারের নীতি-সহায়তা বৃদ্ধি ও কিছু প্রতিবন্ধকতা দূর করা গেলে এ কৃষি খাত আরও এগিয়ে যাবে। বিশ্ব কৃষির বাজারে প্রথমসারির দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কৃষির উন্নতি করতে হচ্ছে বা হবে। এজন্যে কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগের জায়গাটাতে আগ্রহ বাড়াতে হবে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থান উন্নত করতে হবে। বিশ্বব্যাপী খাদ্যেরও একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী জায়গা রয়েছে। সেখানে বাংলাদেশকে পৌঁছাতে হবে। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের কৃষক ভারত-পাকিস্তানের তুলনায় অনেক ভালো রয়েছে। দেশের ৬০ শতাংশ অর্থনীতি তাদের ওপর নির্ভর করছে। কৃষকের মেয়ে গার্মেন্টসে কাজ করছে, আর ছেলে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে। কৃষি খাতে ব্যক্তি উদ্যোগ অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। যারা বিভিন্ন বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, কৃষিকে প্রক্রিয়াজাত শিল্পে রূপ দিয়েছেন, তাদের সহায়তা দিতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ এবং অনিষ্টকারী প্রভাব ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করে কৃষিব্যবস্থাকে সম্ভবত নিরাপদ সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ আশানুরূপ হওয়াতেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধি সাধনে অনিশ্চয়তা ও ভবিতব্যের হাতে বন্দিত্বের অবসান ঘটেছে। ঘটবে। তবে গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল শস্যের উৎপাদনে প্রযুক্তির বিবর্তন ঘটাতে হবে, শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহার করে সাময়িকভাবে উৎপাদন বাড়ানোর ফলে জমির উর্বরা শক্তির অবক্ষয় ঘটতে থাকলে আখেরে চরম বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। খাদ্য শস্যের বর্তমান চাহিদা মেটাতে গিয়ে বিশেষ করে কৃষি এবং সার্বিকভাবে পরিবেশের ভবিষ্যৎ যাতে বিপন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের নদী শাসনের উদ্যোগকে কার্যকর তথা

পানি প্রবাহ যথাযথ রেখে নদীর নাব্যতা বজায় রাখা আবশ্যক হবে। পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নেওয়া হলে কৃষি কাজ তো বটেই, সুপেয় পানির অভাবসহ পরিবেশ বিপন্নতায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাতে পারে বাংলাদেশ। অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে কৃষি জমির যথেচ্ছ ব্যবহার দুঃসহ পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে। নৌপথে যোগাযোগের যে নেটওয়ার্ক নদীমাতৃক বাংলাদেশের, তা অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ের হওয়া সত্ত্বেও, উপযুক্ত পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের অভাবে সেটিও ক্রমশ হাতছাড়া যাতে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দেওয়ার ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের বিকল্প নেই। দ্রুত এবং সহজ যোগাযোগের উপায় হিসেবে সড়ক নেটওয়ার্কের তুলনামূলক উপযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় আসার অর্থ এই হতে পারে না যে, নৌপথ বিলুপ্তির মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হতে হবে। নৌপথের ন্যায্য বিকাশ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়াও মৌসুমী বলয়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্যও অতি জরুরি। মাছভাতের বাঙালির প্রধান দুই উপজীব্যের অস্তিত্ব ও বিকাশ দেশের অগণিত খাল-বিলের নাব্যতার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে প্রকৃত বিনিয়োগ ক্ষেত্র হলো কৃষি। এই কৃষি থেকে খাদ্য (ভাত, মাছ, সবজি ও শর্করা) বস্ত্র, বাসস্থানের সব ব্যবস্থা হয়। কৃষি খাতকে টেকসই করে তোলার মাধ্যমে অপরাপর সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ ও স্বাভাবিক হতে পারে। বাংলাদেশের স্বয়ম্ভর উন্নয়ন ভাবনা এই চিন্তাচেতনাকে অবলম্বন করে হওয়ার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

কৃষির পরে জিডিপিতে বড়ো অবদান শিল্প খাতের। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ট্রেডিং নির্ভরতা থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়াতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ উদীয়মান অর্থনীতি হতে পেরেছে। দেশীয় শিল্প সম্ভাবনাকে উপযুক্ত প্রযত্ন প্রদানের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর শিল্প ভিত্তি ওঠার উপরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। দেশজ কাঁচামাল ব্যবহার দ্বারা প্রয়োজনীয় ফিনিশড্ প্রডাক্ট তৈরিতে দেশের শিল্প খাতকে সক্ষম করে তোলা এবং এর ফলে বিদেশি পণ্যের ওপর আমদানি নির্ভরতা তথ্য মহার্ঘ্য বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি ব্যয় হ্রাস , শিল্প ব্যাবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগে আর বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহারে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রত্যাশিত অগ্রগতির হিসাব সংক্রান্ত তুলনামূলক সারণিগুলোর সাথে বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান ও সম্পর্কের শুমার ও বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশ অর্থনীতির অগ্রগতি ও গতিধারা সনাক্তকরণে অসুবিধা হয় না। দেখা যায় আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ জিডিপির অংশ হিসাবে ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও রপ্তানির মিশ্র প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। যদিও অস্থিতিশীল ও ভিন্ন মাত্রিক ট্যারিফ স্ট্রাকচার এর প্রভাব পড়েছে বহির্বাণিজ্যে ভিন্ন অনুপাতে। এতে বোঝা যায় বিশ্ব বাজারের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য সাধারণ সূত্র অনুসরণ করতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই এগিয়েছে। উৎপাদন না বাড়লেও সরবরাহ বাড়ার প্রবণতায় মূল্যস্থিতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ বাজারে। আবার ইনফরমাল বর্ডার ট্রেডের ফলে দেশজ উৎপাদনের বিপত্তি ঘটেছে। ইনফরমাল ট্রেড বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অদৃশ্য এক অন্ধগলি ও কালো গর্ত হিসেবে কাজ করেছে।

বাংলাদেশের আমদানিকৃত সামগ্রী অন্য দেশে পাচার হয়েছে আবার কোনো কোনো বিদেশি পণ্যের অবৈধ প্রবেশ ঠেকাতে গিয়ে আরোপিত ট্যারিফে দেশি সামগ্রী উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থের সাথে সংঘাত হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের জন্য পুঁজির অপ্রতুলতা থাকায়, বিপুল শ্রমিক শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দেশীয় কাঁচামালের কার্যকর ব্যবহারকল্পে উপযুক্ত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি আমদানির দ্বারা উৎপাদন কৌশল জানা, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানিমুখী শিল্প উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও রূপান্তরে বাংলাদেশ বিদেশি পুঁজি প্রত্যাশী। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা সেই সত্তরের দশক থেকে। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কালে প্রাইভেট সেক্টরের ওপর পাবলিক সেক্টরের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও স্থিতিশীল পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে শিল্প উদ্যোগে পাবলিক সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ শিথিল এবং আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৮০-১৯৮১ সালে সরকার প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়ন লক্ষ্যে নয়া শিল্পনীতিতে কিছু মৌল পরিবর্তন আনেন। উল্লেখ্য, এ সময় ১৯৮০ সালেই ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন অ্যান্ড প্রটেকশন অ্যাক্ট জারি হয়। বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (বেপজা) অ্যাক্টও পাস হয় এ সময়। এতদসত্ত্বেও আশির দশকে বিদেশি বিনিয়োগ তেমন আসেনি বাংলাদেশে। পুরো দশকে ইপিজেড এর বাইরে বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধিত হয় মাত্র ৪০৪ মি. মা. ডলার।

সত্তর ও আশির দশকে অর্থনৈতিক সাহায্য হিসেবে বাংলাদেশে বিদেশি ঋণ ও অনুদান এসেছে মূলত পাবলিক সেক্টরের জন্য। প্রাইভেট সেক্টরের পুঁজির প্রয়োজনীয়তা ও তার চাহিদা সৃষ্টি হয় আশির দশকের শেষ ভাগে। প্রাইভেট সেক্টরের বিকাশ শুরু হলে এবং বিদেশি পুঁজি প্রবেশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সুযোগ-সুবিধার সমাহার ঘটানোর নীতিমালা ঘোষিত হলে, বিনিয়োগ বোর্ড অ্যাক্ট, ১৯৮৯ বলে প্রতিষ্ঠিত পোষক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম শুরু হলে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একই সাথে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ও বাজার অর্থনীতির অবগাহনে বাংলাদেশে সিক্ত হলে, এশীয় উন্নয়ন দেশগুলো বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর উন্নয়নের নতুন ধারা সূচিত হলে (যা এশিয়ান মিরাকল নামে খ্যাত) বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগ উৎস ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ: সাবেক সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বর্তমানে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান

সাব-সেক্টর কমান্ডার সদরুদ্দীন: উত্তর রণাঙ্গনের ক্ষীপ্র ঈগল

ড. মো. নাজমুল হক

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সব সেক্টর ও সাব-সেক্টর কমান্ডার অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করে দুর্ধর্ষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে স্বাধীনতার লাল সূর্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ৬-এ সাব-সেক্টর কমান্ডার ফ্লাইট লে. সদরুদ্দীন আহমেদ। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর চৌকস বৈমানিক, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ত্রাস, স্বল্পভাষী ও স্বল্প আলোচিত আকাশ যুদ্ধের কুশলতা থেকে স্থল যুদ্ধের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নেমে আসা ক্ষীপ্রগতি ঈগল পাখি সদৃশ মুক্তিযুদ্ধের এই মহান বীরের অবদান আমাদের জাতীয় ইতিহাসে প্রেরণার উৎস। ৬ নম্বর সেক্টরের পরিধি ছিল রংপুর -দিনাজপুর জেলার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন আরেক খ্যাতিমান বৈমানিক এম. কে বাশার। তিনি তাঁর অধীন রণাঙ্গনকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিন্যস্ত করেছিলেন। তার মধ্যে ৬-এ সাব-সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হয় বর্তমান পঞ্চগড় জেলাসহ ঠাকুরগাঁয়ের কিছু অংশ। এখানে প্রথম দিকে জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে দায়িত্ব পালন করেন ক্যাপ্টেন নজরুল। পরে এই ফ্রন্টে সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত হন ফ্লাইট লে. সদরুদ্দীন আহমেদ। তাঁকে সহায়তা করেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার।

গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি

জেনারেল ওসমানী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে মে মাসে যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা অস্থায়ী সরকারের নিকট পেশ করেন যাতে নিয়মিত বা সম্মুখ সমরের পাশাপাশি গেরিলা যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পাকিস্তানের মতো একটি শক্তিশালী ও আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে টিকে থাকা খুবই কষ্টকর হবে। তাই গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের ব্যতিব্যস্ত ও অবরুদ্ধ করে সামনে থেকে নিয়মিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। অস্থায়ী সরকার তাঁর পরিকল্পনা মেনে নেন এবং ভারত ও বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতায় অস্ত্র ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

এ সময় ইপিআর, আনসার, সেনাসদস্য ও বিভিন্ন বাহিনীর অনেক সদস্য অবস্থান করছিলেন তেঁতুলিয়াতে। তাদের মধ্যে ইপিআর বাহিনী জনগণের সহযোগিতায় অমরখানা, ভজনপুর এবং তার আশপাশে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তেঁতুলিয়ায় অবস্থানকারী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে ভারতীয় বিএসএফ ও সেনা অফিসারদের আলোচনাক্রমে গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম ব্যাচে ৯০ জনের একটি দল বাংলাবান্ধার বিপরীতে আলিপুরদুয়ারের মূর্তি পাহাড়ের ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করেন। এরপর ক্রমাগত বিভিন্ন দলে প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হয় সেখানে। এর মধ্যে ক্যাপ্টেন নজরুল শুরু করেন তাঁর অপারেশন কার্যক্রম। কিছু দিন পরে তাঁর সাথে যোগ দেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার। ফলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়ে ওঠে আরও শক্তিশালী। তবে এসবই ছিল ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানে।

প্রশিক্ষিত মুক্তিবাহিনীর প্রথম দলের দুই প্লাটুন বা ৯০ জনকে বাংলাদেশের একেবারে পেটের ভেতরে প্রবেশ করে গেরিলা তৎপরতা শুরু করার জন্য পাঠানো হয় জুন মাসের শেষের দিকে। গেরিলা ইউনিটগুলোকে বিভক্ত করা হয় তিনটি বেস বা ইউনিটে:

এক. চাউলহাটি বেস ইউনিট (উত্তর)
দুই. থুকরাবাড়ি ও গরিনাবাড়ি (পশ্চিম)
তিন. চিলাহাটি, হেমকুমারী (পূর্ব) ।

সাব-সেক্টর কমান্ডার ফ্লাইট লে. সদরুদ্দীন আহমেদের দায়িত্ব গ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহত রূপ প্রদানের লক্ষ্যে জুলাই মাসে সমগ্র বাংলাদেশের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে বিভাজন করা হয় যদিও তার আগে থেকেই সকল কার্যক্রম চালু ছিল। সেক্টর বিভাজন মুক্তিযুদ্ধকে নতুন শক্তিতে বলীয়ান করে তোলে। বাঙালি সেনা অফিসারদের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অধিনায়কত্বে সকল মুক্তিযোদ্ধা একটি নিয়মিত বাহিনীর মতো যুদ্ধে অংশগ্রহণ শুরু করে। জুলাই মাসের শেষে অথবা আগস্ট মাসের প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন নজরুলকে অন্যত্র পাঠানো হয়। সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ফ্লাইট লে. সদরুদ্দীন আহমেদ। তিনি প্রথমে তাঁর অফিস স্থাপন করেন তেঁতুলিয়ায়। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি এই রণাঙ্গনের মুক্তিবাহিনীর সবগুলো ইউনিট পরিদর্শন করে বিন্যস্ত করেন নতুন করে। ইপিআর, আনসার ও সেনাসদস্যদের বিভিন্ন ইউনিটকেও কোম্পানি অনুযায়ী বিন্যস্ত ও উজ্জীবিত করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি তাঁর হেড কোয়ার্টার স্থানান্তর করেন তেঁতুলিয়া থেকে ৮ মাইল সামনে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি অমরখানার মুখোমুখি ও ভজনপুরের কাছাকাছি ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে। তিনি তাঁর সঙ্গে রাখেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার ও সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনকে।

তাঁর হেড কোয়ার্টারের অফিস কাম রেসিডেন্স ঘরটি ছিল পাটকাঠির বেড়া, ছন ও টিনের চালা দিয়ে তৈরি। সম্ভবত এটি ছিল কোনো গরিব কৃষকের পরিত্যক্ত একটি গোয়াল ঘর। ঘরের ভেতর একটি নড়বড়ে টেবিল, একই ধরনের কয়েকটি চেয়ার। টেবিলের ওপর ফিল্ড ম্যাপ। বেড়ায় ঝোলানো স্টেনগান। সেখানে বসে তাঁর অফিসার, ইপিআরের কোম্পানি কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, যোগাযোগ করেন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ও আন্তর্জাতিক মাধ্যমের সাথে। এখান থেকেই চলে রসদ ও অস্ত্র সংগ্রহ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌঁছানো। নির্দেশনা দেন ফ্রিডম ফাইটার (এফ.এফ) ও মুক্তিবাহিনীকে। স্থাপন করেন একটি ফিল্ড হাসপাতাল ও লঙ্গরখানা । কোন্ ফ্রন্টে কোথায় কি প্রয়োজন তার সমাধান করেন, মুক্তিবাহিনীর ইউনিটগুলোতে আবশ্যক মতো কমান্ডার পরিবর্তন করে দেন। সৈন্যদের মাসিক ভাতা প্রদান করেন এখান থেকে। এমনকি, দালাল ও রাজাকারদের বন্দি করে রাখা ও জনগণের বিভিন্ন সালিশ পর্যন্ত করতে হয় তাঁকে এই গোয়াল ঘরে বসে। এছাড়া, ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন নিজের নিয়ন্ত্রণে। অক্টোবর মাসে ভারত নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট বেসগুলো বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। তিনি চাউলহাটি ইউনিট বেস এর চৌকস মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে 'মধুপাড়া-৩' নামে একটি নতুন দুর্ধর্ষ কোম্পানি গঠন করে এর কমান্ডার নিযুক্ত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাহবুব আলমকে। দুর্বল এলাকায় নিয়োজিত করেন নতুন মুক্তিযোদ্ধা দল।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর দূরদর্শী ও ক্ষীপ্রগতি কার্যক্রমে ৬-এ সাব-সেক্টরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়ে ওঠে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল। সেপ্টেম্বর মাস থেকেই নিয়মিত বাহিনী সাব-সেক্টর কমান্ডার সদরুদ্দীন আহমেদের নির্দেশে বড়ো বড়ো অপারেশনগুলো পরিচালনা করে। এ মাসেই অমরখানা ও জগদলহাটের পাকিস্তানি সেনাদের শক্ত ঘাঁটিতে সদরুদ্দীন ও ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার একাধিক বার সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং এক দু'বার দখল করে ফেললেও পাকিস্তানি বাহিনীর পরবর্তী তীব্র আক্রমণে তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লে. জেনারেল লছমন সিং ও কয়েকজন পদস্থ সামরিক অফিসার তেঁতুলিয়ার আশপাশের মুক্তাঞ্চলের বেশ কিছ সামরিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন সেক্টর কমান্ডার এম. কে বাশার, সাব-সেক্টর কমান্ডার সদরুদ্দীন ও তাঁর অফিসারগণ। পরিদর্শন শেষে তাঁরা আলোচনায় বসেন এবং দ্রুত চূড়ান্ত যুদ্ধের রূপ প্রণয়নের ব্যাপারে পরামর্শ করেন।

৯ই অক্টোবর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাচের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার লে. আবদুল মতিন চৌধুরী ও লে. মোহাম্মদ মাসুদউর রহমান ৬-এ সাব-সেক্টরে যোগদান করার পর এখানকার সামরিক শক্তি ও সৈনিকদের মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। নতুন উদ্যমে ও পূর্ণ শক্তিতে শুরু হয় নতুন নতুন অপারেশন ও সংঘবদ্ধ আক্রমণ। সম্মুখ ফ্রন্টের মুক্তিযোদ্ধারা পঞ্চগড় শহরকে কেন্দ্র করে আরও ভেতরের দিকে আক্রমণ জোরদার করে তোলেন। এ মাসের প্রথমার্ধের মধ্যে কমান্ডার সদরুদ্দীন গড়ে তোলেন একটি সুশৃঙ্খল নিয়মিত সামরিক ব্যবস্থাপনা। ফলে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কংক্রিটের বাংকারে বসে গোলাবর্ষণ করা ব্যতীত আর কিছু করতে পারে না। তাদের চলাফেরা হয়ে পড়ে সীমিত, এক রকম অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে হয় তাদের।

পঞ্চগড় বিজয়ের যুদ্ধপ্রস্তুতি

নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধে পঞ্চগড় শহর, অমরখানা ও জগদলহাটসহ প্রায় ১০টি স্থানে ও বাংকারে পাকিস্তান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০ জন। বিভিন্ন থানায় ২০০ জন এবং সৈয়দপুর ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার থেকে ভ্রাম্যমাণ সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন। এছাড়া ইপিক্যাপ ও রাজাকার ছিল কয়েক শত। বিভিন্ন অপারেশন ও যুদ্ধ পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন পঞ্চগড় সুগার মিল ও জগদলহাটে একজন করে মেজর। অমরখানা উত্তরের সব চেয়ে অগ্রবর্তী ঘাঁটি হলেও জগদলহাট ছিল পাক বাহিনীর উত্তরাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহৎ এবং সর্বাধিক শক্তিশালী

অবস্থান। এখানে মাটির নীচে শক্তিশালী কংক্রিটের বাংকার নির্মাণ করে অবস্থান করেন একজন মেজর পদবির পাকিস্তানি অফিসার। অমরখানাসহ উত্তরাঞ্চলের সকল অপারেশন ও তৎপরতা পরিচালিত হয় তারই নির্দেশনায়। মূল কমান্ড ও গ্যারিসন নিয়ন্ত্রিত হয় পঞ্চগড় সুগারমিলে অবস্থিত হেড কোয়ার্টার থেকে। উত্তরবঙ্গ সেক্টরের কমান্ড পরিচালনা করেন যথাক্রমে মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ (১৬ ডিভিশন), ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মল (২০৫ ব্রিগেড), ব্রিগেডিয়ার আনসারী (২৩ ব্রিগেড) ও ব্রিগেডিয়ার নঈম (৩৪ ব্রিগেড)। পঞ্চগড় ছিল সৈয়দপুর ব্রিগেড কমান্ডের অন্তর্ভুক্ত।

সাব-সেক্টর কমান্ডার সদরুদ্দীন আহমেদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে সমন্বয় করে অমরখানা, জগদলহাট ও পঞ্চগড় দখলের যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত আক্রমণের তারিখ নির্ধারণ করেন ঈদের পর দিন ২০শে নভেম্বর। তবে ভারতে ১৯ তারিখেই ঈদ উদ্‌যাপিত হলেও বাংলাদেশে ঈদ হয় পর দিন ২০শে নভেম্বর। সুতরাং চূড়ান্ত আক্রমণের দিনটি পড়ে ঈদের দিনেই। সদরুদ্দীন আহমেদ নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়েই তেঁতুলিয়া ও পঞ্চগড় অঞ্চলের সকল মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট এবং ইপিআর কোম্পানিগুলোকে বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে উঠিয়ে এনে অমরখানার সম্মুখবর্তী ফ্রন্টে সমাবেশ করে যুদ্ধের সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাঁর সমন্বিত সৈন্যসংখ্যা উন্নীত হয় এক ব্যাটালিয়নের মতো যা পঞ্চগড় বিজয়ের পর সৈয়দপুর পর্যন্ত যুদ্ধে হয়ে যায় দ্বিগুণ। অপর দিকে, এই যুদ্ধে তাঁর বাহিনীকে পেছন থেকে সাপোর্ট প্রদান করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১২ ও ১৮ রাইফেল রেজিমেন্ট, ৭ম মারাঠা রেজিমেন্ট, ২১ রাজপুত রেজিমেন্ট ও ১৮ রাজপুত রাইফেল রেজিমেন্ট। এ সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর উত্তরাঞ্চল (শিলিগুড়ি) কোরের অধিনায়ক ছিলেন লে. জেনারেল এম. এল থাপান। এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী কামান, ট্যাংক ও আর্টিলারি সাপোর্ট প্রদান করেন।

অমরখানা, জগদলহাট ও পঞ্চগড় শহর দখলের যুদ্ধ

'অ্যাটাক অন অমরখানা' : ২০শে নভেম্বর রাত দশটার দিকে

অধিনায়ক সদরুদ্দীনের নির্দেশে মুক্তিবাহিনী প্রথমে মর্টার ও মেশিনগান দিয়ে ফায়ার ওপেন করে। সঙ্গে সঙ্গে অমরখানা থেকে মর্টার ও কামানের গোলা ছুঁড়ে জবাব দিতে শুরু করে পাকিস্তানি :বাহিনী। সদরুদ্দীনের পুরো ফ্রন্ট পূর্ণোদ্যমে শুরু করে গুলিবর্ষণ। রাত বাড়ার সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে গোলাগুলির তীব্রতা। চাউলহাটি থেকে ভারতীয় বাহিনীর ১২ রাজপুত রেজিমেন্ট, ৭ম মারাঠা রেজিমেন্ট ও বিএসএফ এর আর্টিলারি ইউনিট থেকে অমরখানা পাক ঘাঁটির দিকে ছুটে যায় শত শত শেল। এই প্রচণ্ড তাণ্ডবে পাকিস্তান বাহিনী চার, পাঁচ ঘণ্টা মাটি কামড়ে লড়াই করে যাওয়ার পর টিকতে না পেরে শেষ রাতের দিকে তাদের পজিশন ছেড়ে দিয়ে কয়েক মাইল পেছনে জগদলহাটে নতুন ডিফেন্স গ্রহণ করে। পতন ঘটে পরাক্রমশালী পাকিস্তান বাহিনীর উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে অগ্রবর্তী ঘাঁটি অমরখানা।

'মুভ টু জগদলহাট': প্রথম বিজয়ে উৎফুল্ল মুক্তিবাহিনী সদরুদ্দীনের পরবর্তী নির্দেশে ২১শে নভেম্বর সকালের দিকেই মুভ করা শুরু করে জগদলহাট অভিমুখে। সমস্ত ফ্রন্ট জগদলহাটের কয়েক শত গজ দূরে পৌঁছে গেলে পাক বাহিনীর প্রচণ্ড আর্টিলারি ফায়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। কমান্ডার সদরুদ্দীন তার বাহিনীকে চৈতনপাড়া লাল স্কুলের পাশে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দেন। অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে ট্রেঞ্চ ও বাংকার গড়ে তোলা হয় নতুন ডিফেন্স। গোলা বারুদ ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে। সদরুদ্দীন মুক্তিবাহিনীর চারটি কোম্পানিকে বিভাজন করে পাকা সড়কের পশ্চিম দিকে নিযুক্ত করেন সুবেদার হাফেজের 'এ' কোম্পানি এবং সুবেদার হাশেমের 'ডি' কোম্পানিকে। এই দুই কোম্পানির প্রত্যক্ষ কমান্ডে নিয়োজিত হন সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার লে. মোহাম্মদ আবদুল মতিন চৌধুরী। পাকা সড়কের পূর্ব পাশে স্থাপন করা হয় সুবেদার খালেকের 'বি' কোম্পানি ও সুবেদার মুরাদ আলীর 'ডি' কোম্পানিকে। এ দুই কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত হলেন অপর কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার লে. মাসউদউর রহমান। লাল স্কুলের পাশে মাটির নীচে কমান্ডপোস্ট বা ডাগ আউট তৈরি করে অবস্থান নিলেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার। কখনো ফ্রন্টে, কখনো পেছনে, কখনো ওয়্যারলেস সেটের সামনে, কখনো মিত্রবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে পুরো ফ্রন্টের নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশনা, পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সাব-সেক্টর কমান্ডার সদরুদ্দীন নিজে। ভারতীয় বাহিনী এবং আর্টিলারি অবস্থান গ্রহণ করে কিছুটা পেছনে অমরখানার সামনে।

চৈতনপাড়ায় নতুন ডিফেন্স খোলার পর ২১শে নভেম্বর দিনের বেলা পাক বাহিনীর পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মর্টার ও মেশিনগানের গোলা বর্ষণ করা হলেও ছিল না তেমন তীব্রতা কিন্তু রাত দশটার পর তারা মর্টার, মেশিনগান, কামান ও ভারী অস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে অগ্রসরমান মুক্তিবাহিনীর ওপর। মুক্তিবাহিনীও তাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতা দিয়ে প্রতিআক্রমণ শুরু করে। পেছন থেকে ভারতীয় আর্টিলারি এবং মুজিব ব্যাটারি থেকেও পাঠানো হয় অজস্র শেল ও গোলা। যুদ্ধ চলে সারারাত। পাক বাহিনী মুক্তিবাহিনীকে গুঁড়িয়ে দিতে না পারলেও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। তাদের মূল টার্গেট ছিল পাকা সড়কের পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণকারী লেফট্ ফ্লাঙ্ক বা 'বি' ও 'সি' কোম্পানি। এই প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে তারা পেছন দিকে অগ্রসর হয়ে পুরো ফ্রন্টকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল। ২১ তারিখের যুদ্ধে কোনো পক্ষই জয়ী হতে পারেনি। এতে মুক্তিবাহিনীর ৩০ জন হতাহত হয়। ২২শে নভেম্বর দিনে ও রাতেও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বাম ফ্লাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

এই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় সদরুদ্দীন রি-ইনফোর্সমেন্টের জন্য পূর্বের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিভিন্ন ইউনিট থেকে তুলে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, চৌকষ ও দুর্ধর্ষ গেরিলাদল মধুপাড়া কোম্পানিকে নিয়োজিত করেন প্রায় বিধ্বস্ত বিপজ্জনক বাম ফ্লাঙ্কে। মাহবুব আলমের

অধীনে মধুপাড়া কোম্পানির ৪৭ জনের দলটি ২৩শে নভেম্বর দুপুরে যোগ দেয় জগদলহাট ফ্রন্টে। দুপুরের দিকেই পাক বাহিনীর গোলাগুলির মুখে পড়ে তারা। এ সময় সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন সেনাবাহিনীর সাবেক সৈনিক নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা সকিমউদ্দিন। এই ফ্রন্টে তিনি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে অনেকগুলো গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর শুরু হয় আবারও কামান যুদ্ধ।

মাত্র কয়েকশো গজ দূরত্বে মুখোমুখি অবস্থানরত দুই পক্ষের ফ্রন্ট জেগে ওঠে সন্ধ্যার পরই। মাঝখানে খোলা প্রান্তর। শুরু হয় প্রচণ্ড গুলি বিনিময়। রাত দশটার পর সমগ্র রণাঙ্গন মেশিনগান ও গোলন্দাজ আক্রমণে হয়ে ওঠে বিভীষিকাময়। একটার পর একটা শেল ও গোলা এসে বিস্ফোরিত হয় কখনো ট্রেঞ্চের সামনে, কখনো পাশে, কখনো পেছনে। সাথে সাথে আগুন ও ধূলোবালিতে ধুসরিত হয় যত দূরে চোখ যায়। কখনো শেল বিস্ফোরিত হয় প্রায় মাথার ওপর, ভেঙে যায় ট্রেঞ্চের মাটির দেয়াল। মেশিনগান চালক ঢাকা পড়ে যান মাটির নীচে। তারপরও ছুটে আসে মেশিনগান, স্বয়ংক্রিয় চায়নিজ রাইফেলের গুলি ও কামানের গোলা। যৌথবাহিনীর পক্ষ থেকেও অমরখানা থেকে আসতে থাকে আর্টিলারির অসংখ্য শেল ও গোলা। সেগুলো বিস্ফোরিত হয় পাক বাহিনীর ওপর।

মধ্যরাতে পাকিস্তান বাহিনী দুই প্রতিপক্ষের মাঝখানের আকাশে উড়িয়ে দেয় ফ্লেয়ার লাইট। ফলে পুরো এলাকা দিনের মতো আলোকিত হয়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুপক্ষের অবস্থান জেনে নিয়ে আক্রমণ করা। ফ্লেয়ার লাইট জ্বলে ওঠার সাথে সাথে মুক্তিবাহিনীর ফ্রন্ট গোলাগুলি বন্ধ রাখে কিছুক্ষণের জন্য, শত্রু যেন অবস্থান বুঝে না ফেলে। লাইট নিভে গেলে আবারও শুরু হয় গোলাগুলির তাণ্ডব। এবার ফ্লেয়ার লাইট ছুঁড়ে মারে মুক্তিবাহিনীও। দিনের আলোয় ভরে যায় পাক বাহিনীর অবস্থান। এভাবে চলতে থাকে কয়েক বার। পাক বাহিনীর গোলন্দাজ আক্রমণের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায় ।

সারারাত যুদ্ধের পরও সদরুদ্দীনের মুক্তিবাহিনী, বিশেষত বাম ফ্লাঙ্কে নিয়োজিত মধুপাড়া কোম্পানি তাদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়। আপাতদৃষ্টিতে অজকের রাতের যুদ্ধের ফলাফল অপরিবর্তিত হলেও পাকিস্তান বাহিনী যা বোঝার বুঝে যায়। রাতব্যাপী যুদ্ধের প্রচণ্ড ধকল সামলে ২৪শে নভেম্বর সারাদিন কেটে যায় ফ্রন্ট লাইন পুনর্গঠন করতে। সদরুদ্দীন তাঁর কমান্ডিং অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি বাংকারে অবস্থানরত সৈন্যদের খোঁজখবর নেন এবং আসন্ন রাতের যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেন। এ দিন আরও কিছু মুক্তিযোদ্ধা যোগ দেন ফ্রন্টে। সদরুদ্দীন বিশেষভাবে নির্দেশ দেন যে, কমান্ড পোস্ট থেকে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ গুলি ছুঁড়বে না, পুরো ফ্রন্ট অপেক্ষা করবে নীরবে।

রাত দশটা পর্যন্ত সমস্ত রণাঙ্গনে পরিপূর্ণ নীরবতা বজায় ছিল। পাক বাহিনীর দিক থেকেও কোনো গোলাগুলি ছোঁড়া হয়নি। কিন্তু এর পরই হঠাৎ 'সি' কোম্পানির পজিশন থেকে শোনা যায় একটি গুলির শব্দ। এটি সম্ভবত কোনো অতি উৎসাহী সৈনিকের আত্মঘাতী কাজ। এরপর আরও একটি, তারপর আরও দু'একটা বিচ্ছিন্ন গুলির শব্দ। বাধ্য হয়ে সমস্ত ফ্রন্ট কমান্ডারের নির্দেশ ছাড়াই শুরু করে দেয় যুদ্ধ। পাকিস্তান বাহিনীও শুরু করে পাল্টা গুলি বর্ষণ। কিছুক্ষণ পর দূরবর্তী অবস্থান থেকে প্রথমে পাক বাহিনী এবং সাথে সাথে মুজিব ব্যাটারি ও ভারতীয় আর্টিলারিও শুরু করে দেয় গোলন্দাজ আক্রমণ। মধ্য রাতের পর পাকিস্তানি আক্রমণ হয়ে ওঠে প্রায় অপ্রতিরোধ্য। এক পর্যায়ে তারা ট্রেঞ্চ ছেড়ে উঠে আসে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের মাত্র ৫০ থেকে ১০০ গজের মধ্যে। তবে বাম ফ্লাঙ্কে অবস্থানরত মধুপাড়া কোম্পানির অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুততার সাথে অসংখ্য গ্রেনেড ছুঁড়ে পাক সেনাদের ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সদরুদ্দীনের নির্দেশে এ সময় অমরখানা, সাকাতি ও বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে নতুন উদ্যমে অজস্র শেল নিক্ষেপ শুরু হয় ওই অবস্থানে।

রাত তিনটার পর বন্ধ হয়ে যায় পাক বাহিনীর গোলাবর্ষণ। বেশ কিছু সময় যাবৎ তাদের দিক থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া না যাওয়ায় রাত সাড়ে ৪ টার দিকে সদরুদ্দীন মধুপাড়া কোম্পানি থেকে ৯ জন মুক্তিযোদ্ধাকে জগদলহাটে গিয়ে প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। তাঁর ধারণা, পাক বাহিনী জগদলহাট ডিফেন্স ছেড়ে পঞ্চগড়ের দিকে পিছিয়ে যেতে পারে। কিছু সময় পুরো ফ্রন্টে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। অবশেষে খবর এলো, পাক বাহিনী ৪ দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে জগদলহাট ডিফেন্স ছেড়ে চলে গেছে। সাথে সাথে আনন্দে উল্লাসে বাংকার ও ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলেন শত শত মুক্তিযোদ্ধা। সবাই নিশ্চিত যে, পঞ্চগড় শহর দখল এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

'মার্চ টু পঞ্চগড় টাউন': ২৫শে নভেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় সদরুদ্দীন তার পুরো ট্রুপ্সকে পাকা সড়কের ওপর দিয়ে দুই সারিতে বিন্যস্ত হয়ে পঞ্চগড় শহরের দিকে মার্চ করার নির্দেশ দিলেন। সামনে মুক্তিবাহিনী ও পেছনে মিত্রবাহিনী নির্দেশ অনুযায়ী অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু আধা মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর তারা আবারও পাক বাহিনীর কামান আক্রমণের আওতায় এসে যায়। পেছন থেকে ওয়্যারলেস মারফত সদরুদ্দীন নির্দেশ পাঠান—রাস্তার পাশে নেমে গিয়ে ধানক্ষেত দিয়ে এগিয়ে যাও। পুরো ফ্রন্ট সাথে সাথে রাস্তার নীচে নেমে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করে। আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর সকাল ১১ টার দিকে পাক বাহিনী অগ্রসরমান সৈন্যদের ওপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। ট্রুপ্স সাথে সাথে ধানক্ষেতে লুকিয়ে ফেলে নিজেদের। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয় দুই পক্ষের পেছন থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপ। দুপুরের পর থেমে যায় গোলাগুলি। সদরুদ্দীন নির্দেশ দেন ২০০ গজ দূরে 'মলানী সিংপাড়া' গ্রামে পূর্ব দিকে তালমা নদীগামী একটি রাস্তাকে সামনে রেখে যৌথবাহিনী অবস্থান গ্রহণ করবে।

'মলানী সিংপাড়া রণাঙ্গন': সদরুদ্দীন নির্দেশ দেন যে, ২৫শে ও ২৬শে নভেম্বর পাক বাহিনী ফায়ার ও আক্রমণ না করলে সমস্ত রণাঙ্গন নিষ্ক্রিয় থাকবে। তবে পেট্রল পার্টি থাকবে সর্বোচ্চ সতর্ক

পাহারায় এবং সকল কোম্পানির সকল সৈন্য যে-কোনো সময় যে-কোনো আক্রমণ মোকাবিলার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকবে। লে. মতিন, লে. মাসুদ ও কোম্পানি কমান্ডারদেরও স্ব স্ব ইউনিট ও কোম্পানির সৈন্যদের দেখাশোনা ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজরদারি করার জন্য নির্দেশ দেন সদরুদ্দীন। এ দুই রাতে পাক বাহিনীর দিক থেকে কোনো গোলা বর্ষণ হয় না। তবে পঞ্চগড় শহরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে শোনা যায় ট্যাংক ও কামানের ভারী গোলা বর্ষণের গুরু গম্ভীর আওয়াজ। বোঝা যায় পাক আর্মি এখন ওই ফ্রন্টের আক্রমণ মোকাবিলায় ব্যতিব্যস্ত।

২৭শে নভেম্বর সকালের দিকে সদরুদ্দীন মধুপাড়া কোম্পানি কমান্ডার মাহবুব আলমসহ ৭ জন ইপিআর ও ১০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সামনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশে 'জিটারিং'এ প্রেরণ করেন। দলটি বাম পাশের গ্রামের ভেতর দিয়ে তালমা নদীর পশ্চিমাঞ্চলের দিকে প্রায় ৩০০ গজ এগিয়ে গেলে প্রমাণ পায় শত্রু উপস্থিতির । এ সময় বাঁশবনে ওঁৎ পেতে থাকা পাক বাহিনীর হঠাৎ গুলি বর্ষণে গুরুতরভাবে আহত হয় নায়েক তাফসির। এখানে কিছুক্ষণ গোলাগুলির পর আহত নায়েককে উদ্ধার করে পাঠানো হয় পাশে সদ্য স্থাপিত ফিল্ড হাসপাতালে।

ওই দিন রাতে সদরুদ্দীন পাক বাহিনীর তালমা ঘাঁটি দখলের উদ্দেশে লে. মাসুদকে মাহবুব আলমের কোম্পানির ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও 'বি' কোম্পানির ১৫ জন ইপিআরকে প্রেরণ করেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন ভারতীয় বাহিনীর মেজর শর্মা ও তার ট্রুপ্স। তারা সমন্বিতভাবে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। পাশাপাশি আর্টিলারি সাপোর্ট আসে অমরখানা, সাকাতি, জগদলহাট প্রভৃতি স্থান থেকে। এই আক্রমণে পাক বাহিনীর তালমা ঘাঁটি লন্ডভন্ড ও বিধ্বস্ত হয়ে গেলে তারা তাদের অবস্থান ছেড়ে চলে যায় পঞ্চগড় শহরের দিকে। অবশেষে পতন ঘটে পাক বাহিনীর তৃতীয় শক্ত ঘাঁটি তালমার। ২৮শে নভেম্বর বিকালে পুরো ফ্রন্টকে আরও আধা মাইল সামনে এগিয়ে নিয়োজিত করা হয় পঞ্চগড় শহরের খুব কাছে।

ইতোমধ্যে ভারতীয় ৭ম মারাঠা রেজিমেন্ট, ২১ রাজপুত রেজিমেন্ট এবং ১৮ রাজপুত রাইফেল রেজিমেন্টের দুই ব্যাটালিয়নেরও বেশি সৈনিক ও মুক্তিবাহিনী পঞ্চগড় শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম এলাকা, সিএন্ডবি, রেলওয়ে স্টেশন, জেমকন, সুগার মিল প্রভৃতি স্থানকে সামনে রেখে গড়ে তোলে প্রতিরক্ষা ব্যূহ। এর সঙ্গে ২৭শে নভেম্বর ভোরবেলা পঞ্চগড়ের অদূরে ফকিরগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে দুই স্কোয়াড্রন বা ১২টি ভারতীয় ট্যাংক। ট্যাংকবহর পাক বাহিনীর তীব্র আক্রমণের সামনে পতিত হয় এবং অবরুদ্ধ হয়ে থাকে ৫/৬ ঘণ্টা। ২৫শে নভেম্বর থেকে প্রতি রাতে চলে খুব কাছাকাছি থেকে মিত্র ও পাক বাহিনীর পাল্টাপাল্টি প্রচণ্ড আক্রমণ।

২৮শে নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা সদরুদ্দীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্টের কমান্ডে এক কোম্পানি সৈনিক ও ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়োজিত করেন পঞ্চগড়ের ডান ফ্লাঙ্ক তালমা এলাকায়। মধ্য রাতের পর শহরের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থানরত মিত্রবাহিনী প্রতিরক্ষা লাইন থেকে এক যোগে শুরু করে ট্যাংক, কামান ও গোলন্দাজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণ। মুজিব ব্যাটারি ও ভারতীয় আর্টিলারি থেকে ছুটে আসে শত শত গোলা। সদরুদ্দীনের বাহিনীর সকল কোম্পানি ও ইউনিট একই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বোচ্চ ফায়ারিং পাওয়ার নিয়ে। ভারতীয় আর্টিলারির ৬০টি কামান থেকে নিক্ষেপিত প্রায় ৬০ হাজার গোলার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে ভূকিম্পের মতো ঘন ঘন কাঁপতে থাকে পঞ্চগড়ের মাটি। পাক বাহিনীর দিক থেকেও আসে পাল্টা আঘাত কিন্তু সম্মিলিত বাহিনীর সমন্বিত প্রবল আঘাতের তুলনায় তা ছিল অনেকটাই নিষ্প্রভ।

'এডভান্স টু দি টাউন': রাত সাড়ে চারটার সময় (২৯শে নভেম্বর ভোরে) পঞ্চগড় শহরে প্রবেশ করে দখলে নেওয়ার জন্য নির্দেশ আসে সদরুদ্দীনের। শত শত উৎফুল্ল মুক্তিযোদ্ধা সাথে সাথে বিভিন্ন ট্রেঞ্চ ও বাংকার থেকে উঠে এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় রাস্তার দুপাশে। সবার হাতে উদ্যত মারণাস্ত্র-কাঁধে স্টেনগান, এসএলআর, ২ ইঞ্চি মর্টার, এলএমজি। পরনে সাধারণ লুঙ্গি, প্যান্ট, গেঞ্জি বা মলিন ময়লা শার্ট, মাথায় ও কোমরে গামছা প্যাঁচানো, রোদে-বৃষ্টিতে খাক হয়ে যাওয়া শরীর কিন্তু চোখে দীপ্ত প্রত্যয়। সাব-সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে সকল মুক্তিযোদ্ধা দীপ্ত পদভারে মার্চ করে এগিয়ে যায় শহরের ভেতরে। পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকেও অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসে দলে দলে মুক্তিযোদ্ধা। দু-এক ঘণ্টার মধ্যে বিজয়ের হাসি হাসে অবরুদ্ধ পঞ্চগড় শহর, পঞ্চগড়ের মানুষ। সেই সাথে এত দিনের রাতদিন পরিশ্রম করে সমস্ত রণাঙ্গন পরিচালনার সফলতার আনন্দে আকাশের ঈগল সাব-সেক্টর কমান্ডার সদরুদ্দীন মুক্তির আনন্দে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন তাঁর প্রিয় আকাশ পানে।

পাদটীকা: এরপরের ঘটনা প্রবাহ খুব দ্রুত সংঘটিত হয়। ৬-এ সাব-সেক্টরের সমস্ত এলাকা অতঃপর সদরুদ্দীনের অধিনায়কত্বেই প্রায় যুদ্ধ ছাড়া অথবা স্বল্প গোলাগুলি খরচ করে ৩০শে নভেম্বর ময়দানদিঘি ও ১লা ডিসেম্বর বোদা শহরের পতন ঘটে। অতঃপর তিনিসহ পুরো মিত্রবাহিনী ২রা ডিসেম্বর শেষ রাতে ঠাকুররগাঁও দখল করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেন সৈয়দপুর অভিমুখে।

তথ্যসূত্র:

মাহবুব আলম, *গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে*, ১ম ও ২য় খণ্ড

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: *দলিলপত্র*, সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান

ড. নাজমুল হক, *পঞ্চগড় জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ৩য় সং, ২০২৩

আখতারুজ্জামান মণ্ডল, ১৯৭১, *উত্তরের রণাঙ্গনের বিজয়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯০

ড. নাজমুল হক, *অধ্যাপক (অব.) বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, nazmul.brur.bd@gmail.com*

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবস

জায়েদুল আলম

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাত থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধ শেষ হয় ১৬ই ডিসেম্বরে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয় এই দিনে। তাই প্রতিবছর এই দিনটি যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়।

প্রতিবছর ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জীবনে নিয়ে আসে সংগ্রামী বিজয়ের স্মৃতি। জীবনকে গৌরবান্বিত তোলার শপথ এ পবিত্র দিনটি থেকেই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। বিজয় অর্জন বড়ো কথা নয়, তার সুফলকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই বড়ো কথা। 'স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন'– এ আপ্তবাক্যটিকে আমাদের ভুলে গেলে বিজয় দিবসের তাৎপর্য অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বিজয় মহান, কিন্তু বিজয়ের জন্য সংগ্রাম মহত্তর। প্রতিটি বিজয়ের জন্য কঠোর সংগ্রাম প্রয়োজন। আমাদের বিজয় দিবসের মহান অর্জনের পেছনেও বীর বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের ইতিহাস রয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় প্রথম থেকেই বাঙালিদের মনে পশ্চিমা শোষণ থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছার জাগরণ ঘটে।

১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তঝরা সংগ্রামের পর ১৬ই ডিসেম্বরে মহান বিজয় সাধিত হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা মূলত এই নয়মাসের ফসল নয়, এর শুরু হয়েছে অনেক আগে। ১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত আমাদের দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায় দুশো বছর শাসনের পর ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিলে বাংলাদেশ হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ।

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ছিল দুটি আলাদা ভূখণ্ডে বিভক্ত। পূর্ব বাংলা পরিচিত ছিল পূর্ব পাকিস্তান নামে। অন্যটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করত।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র। বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে তখন উক্ত রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ ছিল, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ। তাদের দুঃশাসন ও অর্থনৈতিক শোষণে এদেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ প্রথম তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার, দুঃশাসন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মুখ বুজে সহ্য করেনি। ১৯৬২, ১৯৬৬-এর ছাত্র আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তারা বুঝিয়ে দেয় বাঙালি কারো হাতে বন্দি থাকতে রাজি নয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও তাদের নিকট শাসনভার না দিয়ে চালাতে থাকে ষড়যন্ত্র। সারা বাংলায় শুরু হয় তুমুল আন্দোলন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশের নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা করে অসংখ্য বাঙালিকে। এ বর্বরতা বাঙালিদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। তারাও প্রতিরোধের পথ বেছে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায়। মধ্যরাতের পর তারা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এরপর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

এদেশের সর্বস্তরের জনগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে এদেশের জনগণ। পাকিস্তানিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি এ দেশের শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, নারী। ঘরবাড়ি, দোকানপাট সবকিছু তাদের গোলার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এসব অত্যাচারের মুখে বাঙালিরাও বসে থাকেনি। এ অবস্থায় বাঙালিরা রুখে দাঁড়ায়। গর্জে ওঠে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলে।

দেশের সবখানে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, আনসার, ছাত্র, যুবক, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী-সাহিত্যিক, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাইকে নিয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনী দেশের সীমান্তে এবং দেশের ভেতরে যুগপৎভাবে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। মুক্তিবাহিনী রুখে দাঁড়িয়ে গণহত্যাকারী পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করতে থাকে। প্রতিবেশী ভারত অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করে। যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে। সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলে।

দীর্ঘ ৯ মাস হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো এক শক্তিমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন দেশের সব ধর্ম, বর্ণ, ভাষার বীর সন্তানরা। ৩০ লাখ মানুষের প্রাণ, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম আর বিপুল সম্পদহানির মধ্য দিয়ে মুক্তির সংগ্রামে সফল হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। ছিনিয়ে এনেছিলেন চূড়ান্ত বিজয়। জাতিকে মুক্ত করেছিলেন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনী এই দিনে যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেদিন ঢাকার কেন্দ্রস্থলে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের পক্ষে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী। তিনি যৌথবাহিনীর প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর উপ-সর্বাধিনায়ক ও ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আবদুল করিম খোন্দকার উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের এই দিনে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী স্বাধীনতাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং বাংলাদেশ (পরবর্তীকালে একটি শব্দ হিসেবে ব্যবহার শুরু করা হয়) নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল দেশ স্বাধীনতার মাসে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ নয় মাসের এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়। ফলে বিশ্বের সপ্তম-জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের

উত্থান ঘটে, যা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক দৃশ্যপট বদলে দেয়। ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে বিজয় দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৭১ সালের এই ডিসেম্বর মাসেই বাংলার আকাশে উদিত হয়েছিল স্বাধীনতার সূর্য, উড্ডীন হয়েছিল লাল-সবুজ পতাকা। বাতাসে অনুরণন তুলেছিল অগণিত কণ্ঠের সুর 'আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালোবাসি'।

বিজয় দিবস দিনটি একদিকে যেমন এ দেশের মানুষের কাছে

চিরকালের, চিরগৌরব ও আনন্দের; তেমনি একই সঙ্গে স্বজন হারানোর দিন। জাতি এই বিজয়ের আনন্দের দিনে গভীর কৃতজ্ঞতা ও পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর সন্তানদের।

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ শাহাদতবরণ করেছে। তাদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমরা সেই শহিদদের কাছে চিরঋণী। আমাদের সব কর্ম ও উন্নয়ন চেতনার মূলে রয়েছে শহিদদের আত্মত্যাগ। তারাই আমাদের অহংকার, আমাদের গৌরব। ঐ দিন বাংলার আকাশে বিজয়ের লাল সূর্য উদিত হয়।

চারদিকে মানুষের মনে মুক্তির আনন্দ হিল্লোল জেগে ওঠে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলার আকাশে উদিত হয়েছিল মুক্তির লাল টকটকে সূর্য। স্বজন হারানোর বেদনা ভুলে মানুষ সেদিন মুক্তির আনন্দে রাজপথে নেমেছিল। মুক্তির উল্লাসে মুখরিত ছিল বাংলার আকাশ-বাতাস। ১৯৭১ সালের এই বিজয়ের দিনটি ছিল বাঙালির মহা উৎসবের দিন। এর চেয়ে আনন্দের দিন বাঙালির জীবনে আর আসেনি।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সূচিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ৫৩ বছর পেরিয়ে গেছে। রাজনৈতিক মুক্তি অর্জিত হলেও দেশের আপামর জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আজও অর্জিত হয়নি। প্রতিবছর বিজয় দিবসের আদর্শ আমাদের কর্ণকুহরে যে বার্তা শোনায়, বাস্তব জীবনে আমরা তা ভুলে যাই বার বার। তবু বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অদম্য প্রতিজ্ঞায় ঋদ্ধ হয়ে উঠি আমরা। আমরা বিজয়ের তাৎপর্যকে যথার্থতা দানে সফল হলেই এ দিবস উদ্‌যাপনের সার্থকতা ফুটে উঠবে।

বাঙালির জীবনের এক ঐতিহাসিক দিন ১৬ই ডিসেম্বর। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অর্জিত বিজয় আমাদের চেতনায় চির অম্লান। আমাদের জাতীয় জীবনে তাই এ বিজয় দিবসের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এ বিজয় আমাদের এনে দিয়েছে মুক্ত জীবনের স্বাদ। আমরা এখন স্বাধীন। এ বিজয়ের ফলে আমরা পেয়েছি একটি পতাকা, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছি নিজেদের অবস্থান। এ পাওয়া আমাদের অনেক বড়ো পাওয়া। এ বিজয় আমাদের শিখিয়েছে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। সমগ্র বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের প্রেরণা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর অশিক্ষার বিরুদ্ধে নতুন সংগ্রামে বিজয় দিবস আমাদের প্রেরণার উৎস। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে বাঙালি জাতি অবতীর্ণ হয়েছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। লাখো শহিদের সেই স্বপ্ন-সাধ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই বিজয় দিবসের চেতনা চিরজাগ্রত রাখা সম্ভব। বাঙালি জাতি এদিনই স্বাধীন জাতি হিসেবে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে সগৌরবে জয়যাত্রা শুরু করেছে। তাই প্রতিবছর যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

বিজয় দিবস একটি অমূল্য ঐতিহাসিক দিন, যা আমাদের মনে জাগায় স্বাধীনতা, সাহস এবং জনগণের একত্রীকরণের চেতনা। এই দিনটি আমাদেরকে জাতীয় গর্ব এবং অভিমান দেয়, সেই গর্বের সাথে আমরা স্মরণ করি কীভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা

বিপ্লব, সংগ্রাম এবং বিজয়ের জন্য অসংখ্য জীবন বিপন্ন করেছিলেন। বিজয় দিবসের চেতনা আমাদের মনে জাগিয়ে দেয় যে সংগ্রাম, সঙ্গে একত্রিত জনগণের সংঘর্ষ এবং অপরাজেয়তা পরাজিত করতে সক্ষম হয়। এই চেতনা আমাদের মনে জাগিয়ে দেয় যে-কোনো প্রতিবাদ, যুদ্ধ, বিপণ্ড বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য, ন্যায় এবং মানবিকতা জয়লাভের জন্য সম্পূর্ণ সংগ্রাম করা উচিত।

অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগের পর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তাই বিজয় দিবস আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এদিন উদ্‌যাপনের পাশাপাশি শহিদদের ত্যাগের প্রতি সম্মান জানাবো।

বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের বিজয়। এ বিজয় বাঙালি জাতির অবিস্মরণীয় গৌরবের ধন। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিবছর ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পালন করা হয়। বিজয়ের চেতনা জাতির সব কর্মকাণ্ডে প্রবাহিত করতে হবে।

১৯৭২ সালের ২২শে জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে দিনটিকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দিনটি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বিজয়ের অনুভূতি সব সময়ই আনন্দের। তবে একই সঙ্গে দিনটি বেদনারও, বিশেষ করে যারা স্বজন হারিয়েছেন, তাদের জন্য। অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের ফসল আমাদের স্বাধীনতা। আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের; যেসব নারী ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তাদের।

এ দেশের মানুষের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার তথা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দেন অবিচল একদল রাজনৈতিক নেতা। কোটি কোটি মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন তাঁরা। তাদের সবাইকেই আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। বিজয়ের আনন্দের স্বাদ সবচেয়ে আলাদা, তা বলাই বাহুল্য। আর তা যদি হয় পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার জয়, তবে সেই আনন্দ হয় বর্ণিল ও গৌরবের। আমরা সেই সৌভাগ্যবান জাতির একটি, যাদের আছে বিজয়ের আনন্দে মাতোয়ারা হওয়ার দিন।

সবশেষে বলি, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি পরাধীনতার শেকল ভেঙে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে। ২৪ বছরের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতির ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় এক নতুন সূর্যোদয়। প্রভাত সূর্যের রক্তাভ ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। তবে আজ আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ দশক পেরিয়ে এসে আমরা কতটা এগিয়েছি, কী ছিল আমাদের লক্ষ্য ও প্রত্যাশা, পূরণ হয়েছে তার কতটা। কোথায় আমাদের ব্যর্থতা, কী এর কারণ। স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য যদি হয় ভৌগোলিকভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়া, তাহলে তা অর্জিত হয়েছে। তবে শুধু এটুকুই মানুষের প্রত্যাশা ছিল না। পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে দেশে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিসহ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশাও ছিল ব্যাপকভাবে। এটা সত্য-দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার প্রসার, নারী উন্নয়ন, শিশুমৃত্যুর হার কমানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে আমাদের। মাথাপিছু আয় বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়তে এবং মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখি। দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যাই, গড়ে তুলি উন্নত-সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ ।

জায়েদুল আলম: শিক্ষাবিদ ও গবেষক, zaidulalam@yahoo.com

বাংলাদেশ সরকার ও ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশ সরকার ও ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে ‘Amendment to the Framework Agreement between the Government of the PeopleÕs Republic of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Denmark regarding the Bangladesh Development Programme (2023-2028)’ শীর্ষক একটি সংশোধিত অনুদান চুক্তি ১১ই ডিসেম্বর ঢাকায় শেরে বাংলা নগর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সংশোধিত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশ সরকারকে ৩৫.০০ মিলিয়ন ডিকেকে (প্রায় ৫৯ কোটি টাকা) অনুদান সহায়তা প্রদান করবে। বাংলাদেশের পরিবর্তিত পটভূমিতে উন্নয়ন কার্যক্রমসহ মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সুশাসন সমন্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের চলমান সংস্কার কর্মসূচিতে সহায়তার জন্য ডেনমার্ক সরকার এ অনুদান সহায়তা প্রদান করবে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মোঃ শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে ডেনমার্কের বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত ঈযৎরংঃরধহ ইৎরী গড়ষষবৎ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডেনমার্ক দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

মুক্তিযুদ্ধকে তরুণ প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে

আলী হাসান

দেশ-মাতৃকার নিগড়ে আত্মবিসর্জনের অকুণ্ঠ অভিপ্রায় কিংবা সময়োচিত আত্মবলিদানের আত্মপ্রত্যয়ে একবিন্দু ঘাটতি থাকলেও কোনো ব্যক্তি প্রকৃত 'দেশ প্রেমিক' অভিধায় অভিহিত হতে পারে না বলে দেশের জন্য সর্বাত্মকভাবে নিবেদিত মহাজনেরা মনে করেন। মা, মাটি ও মানুষের জন্য আত্মদানের গাণিতিক পরিসংখ্যান এমনি সূক্ষ্ম উচ্চতায় ও বস্তুনিষ্ঠ কাঠিন্যে নির্মেদ। কিন্তু অতিশয় পরিতাপের ব্যাপার যে– এই আপ্তবাক্য দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অনেক মুক্তিযোদ্ধাও প্রকৃতভাবে অনুধাবনে অক্ষম। এর চেয়ে আত্মদংশনের আর কী হতে পারে! এ কথা তো দিবালোকের মতো সত্য ও স্পষ্ট যে– 'একজন রাজাকার-আলবদর সারা জীবনের জন্যই রাজাকার-আলবদর কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা সারা জীবনের জন্যই মুক্তিযোদ্ধা নয়।'

'মুক্তিযুদ্ধ' একটি বিশেষ দর্শন, আইডিয়া কিংবা ধারণা বিশেষ– যার উৎপত্তি একজন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ মানবিক মূল্যবোধের গোপন কোঠরে। মুক্তিযুদ্ধের এই বিশেষ পবিত্র-দর্শনের নিমিত্তেই একজন বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আত্মবলিদান করেছিল এবং সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ কি একাত্তরের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র নয় মাসের মানবিক মূল্যবোধের সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিক ও শারীরিক শ্রমের কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক মূল্যবোধের কার্যকাল কি ঐ নয় মাসেই সীমাবদ্ধ? না, তা নয় কিছুতেই। মুক্তিযুদ্ধ একটি জীবন্ত চলমান প্রক্রিয়া। এই দর্শন সদা সর্বত্র জাজ্বল্যমানতায় প্রবহমান এবং তা একই মূল্যবোধকে ধারণ করে, একইভাবে স্রোতবাহিত। একজন মুক্তিযোদ্ধা যতকাল এ ধরাধামে জীবিত থাকবেন ততদিনই তিনি মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়েরই মতো ধারণ করে জীবন নির্বাহ করবেন এবং প্রগতিশীলতার পথ ধরে দেশমাতৃকার তরে তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন– এমনই প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও নির্মম বাস্তবতায় আমরা কি তা দেখতে পাই? যে-কেউ এই প্রশ্নের উত্তরে নেতিবাচক মনোভাবই ব্যক্ত করবেন। তাহলে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন কতটুকু! এ প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

যেহেতু বলা হচ্ছে– মুক্তিযুদ্ধ একটি চলমান দর্শন-প্রক্রিয়ার নাম এবং এটা সবসময়ের জন্যই তাকে নির্মোহ ও সেক্যুলার মনোভাবই বহন করতে হবে। কিন্তু বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধাই মনে করেন– আমি নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করেছি, আমার মুক্তিযোদ্ধার প্রমাণপত্র হিসেবে সার্টিফিকেট আছে; সুতরাং আমি সকল সময়ের জন্যই একজন বিশুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা। আসলে সার্টিফিকেট অর্জনকারী মুক্তিযোদ্ধা যে তার মানবিক মূল্যবোধের জায়গাটি তার নেতিবাচক কর্মকাণ্ড কিংবা মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে হারাতে পারে– তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না অথবা ইচ্ছে করে নিজের ব্যক্তিত্ব ও মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিচ্ছে, দিয়ে চলেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বৃহৎ অংশ স্বাধীনতার অর্ধশতাধিক বৎসর পরও জীবিত আছেন, সক্রিয় আছেন। এটা যে দেশের জন্য, আপামর মানুষের জন্য

একটি কত বড়ো প্রাপ্তি তা বলে কিংবা লিখে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যাবে না। হ্যাঁ, এটা সর্বজন বিদিত যে– স্বাধীনতার পর অনেক সরকারই তাদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্বাধীনতার যত ক্ষতি করেছে, মুক্তিযুদ্ধকালীন পশ্চিমা পাকিস্তানও এত ক্ষতি করতে পারেনি। অপ্রিয় হলেও সত্য যে– অনেক সরকারই প্রচুরসংখ্যক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিতর্কিত ও কালিমালিপ্ত করেছে। কোনো কোনো সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে যারপরনাই সীমাহীন আঘাতও করেছে। এর ক্ষত শুকাতে কতকাল কেটে যাবে তা কে জানে। আর এটা কে না জানে যে– রাষ্ট্র-ক্ষমতার সরাসরি প্রভাব সব সময়ই জনমানসের ওপরে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পড়ে থাকে।

এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির কাছে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা এবং যতদিন বাঙালি জাতি থাকবে ততদিনই এই মুক্তিযুদ্ধ তার গৌরব ও মর্যাদা নিয়ে বর্তমান থাকবে এবং সেটা এ ভূখণ্ডের মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরবের অধ্যায় হিসেবে, অবিস্মরণীয় এক গৌরবগাথা হিসেবে।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি সুদূর সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতি কোনো না কোনো বিদেশি শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে; শাসকদের নিষ্ঠুর জাঁতাকলে অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়েছে। কখনো মোগল-পাঠান, কখনো ব্রিটিশ, কখনো পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছে এ ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষ। বিদেশি শাসকদের নিষ্ঠুর জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে এ অঞ্চলের মানুষ যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। যে শাসকই এসেছে তারাই তাদের সর্বোচ্চ মাত্রার শোষণ অব্যাহত রেখেছে এ ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষের ওপর। বলা যায়– বাঙালির ইতিহাস মানেই ধারাবাহিকভাবে শোষণ আর জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চনার ইতিহাস। বাঙালির ইতিহাস মানেই ন্যায্যপ্রাপ্তিগুলো না পাওয়া আর চরম বেদনাবোধের ইতিহাস।

বর্তমান বাংলাদেশে আজকের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দরকার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তাদের সামনে উপস্থাপন করা, বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা। এজন্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে রচিত বই, মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত বিভিন্ন ছায়াছবি, মঞ্চ নাটক ও টিভি নাটক এগুলো আরও বেশি করে প্রচার করা দরকার। আজকের প্রজন্মের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরা দরকার যে, মুক্তযুদ্ধে বাঙালি জাতিকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে, সীমাহীন ত্যাগ ও তিতিক্ষা সহ্য করতে হয়েছে। দেশ মাতৃকাকে রক্ষার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা যে তাদের জীবনকে তুচ্ছ করে, নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দেশমাতা ও মাতৃভূমিকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয়ের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, তা নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে, অনুধাবন করাতে হবে। নতুন প্রজন্মকেও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। বর্তমান বাংলাদেশে কারা সেই চেতনা ধারণ করছে, কারা বিকৃত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাও জানাতে হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। নতুন প্রজন্মকে আমাদের জানাতে হবে যে– মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি জাতিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যত ধরনের নিষ্ঠুর ও মানবতাবিরোধী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ফলে পাকিস্তানিরা এ দেশের শ্রমজীবী মানুষ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক নির্দেশনাকারী সূর্য-সন্তানদের হত্যা করেছিল। যাতে প্রাগ্রসর এই পেশাজীবী মানুষগুলো দ্বারা এই দেশ কোনোভাবেই এগিয়ে যেতে না পারে।

একটি সর্বাত্মক জনযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি কীভাবে তাদের পরাজিত করেছিল, তার যথাযথ ইতিহাস বর্তমানের নতুন প্রজন্ম, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব ও কর্তব্য সবাইকে নিতে হবে। তবে আমরা সেই দায়িত্ব-কর্তব্য কতটুকু

পালন করতে সমর্থ হচ্ছি বর্তমানে সেই প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে– এখনকার প্রজন্ম আধুনিক এআই টেকনোলজির প্রজন্ম। এই প্রজন্মের চোখ-কান সব সময়ের জন্যই খোলা রয়েছে। তরুণসমাজ, তারুণ্য একটি প্রাণশক্তি যা অফুরন্ত সম্ভাবনা ও বহুবর্ণিল আশা ও স্বপ্ন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে সর্বত্র। মনে রাখতে হবে– বর্তমান তরুণদের ভাবনাগুলো হতে হবে বাংলাদেশের ভাবনা, বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবনা এবং বিশ্বব্যাপী সব দিক দিয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার ভাবনা। অর্থাৎ আজকের তরুণসমাজের আপাদমস্তক চিন্তাভাবনা হতে হবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটাকে ঘিরে। তরুণ প্রজন্মের মনন, চিন্তা, কর্ম ও অস্তিত্বে থাকবে শুধুই বাংলাদেশ। তরুণদের কাজ হবে বাংলাদেশকে নতুনভাবে নির্মাণ করার কাজ। তাদের সব স্বপ্ন দেখতে হবে বাংলাদেশকে নিয়ে, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে।

বাংলাদেশের সব গৌরবময় অর্জন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করে ১৯৭১ সালকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে হবে। সমাজ থেকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি দূর করতে হবে। সামাজিক সমস্যাগুলোকে নিজেদের কাঁধ থেকে নামাতে হবে এবং সেগুলো নিয়ে সুষ্ঠু সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আওতা আরও বাড়াতে হবে এবং এ বিষয়ে গভীরভাবে এবং বিস্তৃত পরিসরে চিন্তাভাবনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে– পাকিস্তানের আধিপত্য ও তাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম একটি অস্ত্র ছিল আমাদের হাজার বছরের বাঙালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। গ্রামপর্যায়ে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিতে হবে। অস্বীকার করা যাবে না যে– এ ব্যাপারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নিজস্বতা ও বাঙালির চিরন্তন গর্বের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালির গৌরবের বিষয়গুলো নিয়ে একটি গণসচেতনতামূলক প্রচার চালানো দরকার। যেখানে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সুষ্ঠু ও সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত পরিসরে জানানোর চর্চা থাকবে। কেন বাংলাদেশ নামক একটি দেশের জন্ম হয়েছিল এবং কী কারণে লাখ লাখ মানুষ ১৯৭১ সালে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল সেটা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি সত্য; কিন্তু তাদেরকে সঠিক ইতিহাস পাঠ করার মধ্য দিয়ে এবং তাদের মানস চক্ষুর ভেতর দিয়ে সেটাই দেখাতে হবে।

এটা দুঃখজনক যে, যখন যে সরকার আসে, সে সময়ই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন করে থকে। নিজেদের চাহিদা বা সুবিধামতো ইতিহাসের পরিবর্তন করে নেয় তারা। এই পরিবর্তন কোনোভাবেই একটি জাতির জন্য সুখের বিষয় নয়। শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নয়, যে-কোনো ইতিহাস বিকৃতি একটি জাতিকে ধ্বংস আর বিভ্রান্ত করারই নামান্তর। মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন প্রজন্মের পাশে থাকতে হবে এবং পাশে দাঁড়াতে হবে দেশের বুদ্ধিজীবী, চিন্তানায়ক ও বিজ্ঞ অভিভাবকদের। মনে রাখা চাই, তারুণ্যই একটি দেশের সবচেয়ে বড়ো প্রাণশক্তি, যা অফুরন্ত সম্ভাবনা ও বর্ণিল স্বপ্ন দ্বারা উজ্জীবিত থাকে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সঠিক চিন্তা এবং চেতনার স্ফুলিঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। দেশজুড়ে তারুণ্যের জয়গান রচনা করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই তরুণ প্রজন্মকে উদ্দীপ্ত শিখায় পরিণত করতে পারে, যা হয়ে উঠতে পারে নক্ষত্রের মতো সমুজ্জ্বল। অর্থাৎ এমনভাবে এগিয়ে যেতে হবে যেন– তরুণদের স্বপ্নই হবে বাংলাদেশের স্বপ্ন, তাদের নিটোল ভাবনাগুলো হবে বাংলাদেশের ভাবনা, উন্নয়নমূলক কাজগুলো হবে বাংলাদেশেরই কাজ। তরুণদের হাতেই নির্মিত হোক আগামীর বাংলাদেশ।

আলী হাসান: লেখক, সংস্কৃতিকর্মী

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়

খান চমন-ই এলাহি

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, মধুমতি, কপোতাক্ষ, কর্ণফুলি, কিংবা পিয়াইন থেকে হরিণঘাটার মতো অসংখ্য নদ-নদীর দেশ বাংলাদেশ। এখানে জলের স্রোতের সঙ্গে, উজান-ভাটির সঙ্গে স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ ভর করে। নদী বয়ে বয়ে সুদূরে গিয়ে সাগর সঙ্গম করে। নদীদের মিলন-বিরহে নতুন কথামালা সৃজন হয়। এমন বৈচিত্র্যের মধ্যে এখানকার অনার্য-আর্য, স্থানীয়-বহিরাগত, আদিবাসী-অভিবাসীর মধ্যে এমন সম্পর্কের সূচনা করে যা এক ও অভিন্ন স্বপ্নের মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। যদিও ধর্ম-মত-পথ-আদর্শের ভিন্নতা বহমান, তবুও আবহমান সত্য, এ ভূখণ্ডের মানুষ বাংলাদেশ প্রেমে বাঁধা। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে লাল-সবুজের পতাকা ও বাংলাদেশ পেয়েছি।

এ বিজয় একদিনে যেমন আসেনি, তেমনি একদিনের জন্য চোখের আড়ালও করা যায়নি। স্থানীয়-বহিরাগত শত্রু-শকুনের দল নানাভাবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা অববাহিকার মানুষের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে চেয়েছে। পলাশীর আম্রকাননে যেমন এ ভূমির স্বাধীনতার সূর্য ১৭৫৭ সালে অস্ত গিয়েছিল তা আবার উদ্ধারও হয়েছিল। দোলনা যেমন সামনে আর পেছনে যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাও যেন তেমন আগে পিছে করেছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এ পর্যন্ত বহুবার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে আবার তা রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে আলোর মুখ দেখেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্মের পতাকা উত্তোলনের সময় বাংলাদেশ পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারত, তিন বা ততোধিকও রাষ্ট্রও গঠিত হতে পারত। তেমনটি হলে ইতিহাস যেমন আলাদা হতো তেমন বিতর্কও হতো না।

যে চক্রান্ত বা বিতর্কের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ এসেছে তার জন্য আরও বহু পথ এগোতে হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১, পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বুঝতে ব্যর্থ হলো। এমনকি, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষকে অবজ্ঞা-অবহেলা করল। রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করল, অর্থনৈতিক সামাজিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন নীতির পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করে চলল। পূর্ব পাকিস্তানকে করল শোষণ। শাসক শ্রেণির সঙ্গে সাধারণ মানুষের তফাৎ তৈরি হলো। দুই পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বাড়ল। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন যেমন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, তেমনি ঐক্যবদ্ধ করতে থাকা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান আর ১৯৭০-এর নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে উদাত্ত আহ্বান জানালো। ১৯৭১ সালে চলমান রাজনৈতিক সংকটে এলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার আহ্বান। ১৯৭১-এর মার্চের উত্তাল সময় বাঙালির পিঠ দেওয়ালে ঠেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ছাত্র নেতৃত্বের দৃঢ়তা, বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক বেসামরিক ব্যক্তিবর্গকে ভাবিয়ে তুলল। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা গণহত্যা শুরু করে। নিরস্ত্র জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রান্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন। ছাত্র-জনতা, কৃষক-মুটে-মজুর, সর্বপ্রকার শ্রেণি-পেশার

মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এদেশের বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় স্বাধীনতাযুদ্ধ। জীবন বাজি রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন মুক্তিযোদ্ধারা। বাংলাদেশ এক সাগর রক্তে পরিণত হয়। শহিদ হন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা। মা-বোন সম্ভ্রম হারায়। মানুষের ঘরবাড়ি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়। এদেশ জীবন-সম্পদ ও সম্মান হারায়। তারপর আসে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চেতনায় বিশ্বাসে আছে বলে বিজয়; লাল-সবুজের পতাকার বিজয়, জাতীয় সংগীতের বিজয়, বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের বিজয়, আকাশে-বাতাসে চিরকাল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে। ভালোবাসায় সিক্ত হয় বিজয়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য। বাংলাদেশের বিজয় সোনার হরফে লেখা।

ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর ছাত্র-জনতার আন্দোলন-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে জাতি পুষ্ট হয়েছে, ঋদ্ধ হয়েছে তার স্বাধীনতা ও বিজয় নিশ্চিত করেছে সে জাতি অর্থাৎ বাংলাদেশের সকল ধর্ম-পথ-মতের মানুষকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে বার বার ফিরে যেতে হবে। ছাত্র-জনতা, শ্রেণি-গোত্র, ধর্ম-মত নির্বিশেষে বিজয়কে বুকের গহীন থেকে জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র আর বিশ্বায়নে সমানভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই ১৯৭১-এর পথ ধরে যে বিজয় তা সকল সংগ্রামে পথ দেখাবে। সাময়িক শাসন-শোষণ আসতে পারে, জুলুম-নির্যাতন আসতে পারে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত আসতে পারে কিন্তু তা বেশিদিন টিকে থাকবে না। অতীত ইতিহাস কিংবা পদ্মা-মেঘনা-যমুনার জলস্রোত, জোয়ার ভাটার চরিত্রের এই বাংলাদেশের ভূমি সেই শিক্ষা দেয়। আর এখানকার তারুণ্য এবং ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রয়াসও বিজয়কে সেভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।

খান চমন-ই এলাহি: কবি, কথাসাহিত্যিক ও অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বাংলাদেশ সরকার ও এডিবির মধ্যে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর মধ্যে 'Strengthening Economic Management and Governance Program, Subprogram' শীর্ষক কর্মসূচির জন্য ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মোঃ শারিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং এডিবি'র পক্ষে বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের অফিসার ইন চার্জ Jiangbo Ning এ ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় বাংলাদেশ সরকারের ও এডিবি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঋণচুক্তি অনুযায়ী কর্মসূচির প্রধান নীতি সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ হলো আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নীতকরণ এবং বাণিজ্য নীতি ও লজিস্টিকস শক্তিশালীকরণ।

প্রতিবেদন: সুবাস দত্ত

শহিদ বাচ্চু মিয়া: মুক্তিযুদ্ধে রক্তঋণ

মিয়াজান কবীর

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার বগৈর গ্রামে ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া। তার বাবার নাম রইস উদ্দিন আর মায়ের নাম মুক্তা বিবি। বাবা-মায়ের ছয় ছেলে সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান।

বাচ্চু মিয়ার পড়ালেখায় হাতেখড়ি বগৈর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করার পর তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৮ সালে আসামের পাহাড়ি ঢলে সারাদেশে প্রবল বন্যার সৃষ্টি হয়। ক্ষেতের ধান-পাট সবকিছু বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যার দরুন বাচ্চু মিয়া লেখাপড়া ছেড়ে বাবার সঙ্গে ক্ষেত-খামারে কাজ শুরু করেন। এই সময় সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে বাচ্চু মিয়াকে বিয়ে করানোর সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোহাগপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের মেয়ে সখিনা বেগমের সঙ্গে ১৯৬৪ সালে বিয়ে হয়। বাচ্চু মিয়া বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে ক্ষেতে কাজ করে হাঁপিয়ে ওঠেন। তাই তিনি মনে মনে চাকরি করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। চাকরির প্রত্যাশায় প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন তিনি। অনেক প্রচেষ্টার পর ১৯৬৮ সালে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিসে ফায়ারম্যান পদে যোগদান করেন। চাকরির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে ভৈরব নদী ফায়ার স্টেশনে পোস্টিং হয়। চাকরি পাবার পর বাবা-মা, স্ত্রী পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে থাকেন বাচ্চু মিয়া। সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবনে তিনি লাভ করেন এক পুত্রসন্তান।

ইতিহাসের পাতায় ১৯৭১ সাল বাঙালি জাতির কাছে রক্তকরোজ্জ্বল এক অধ্যায়। এই সময় মার্চ মাসে শুরু হয় স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অসহযোগ আন্দোলন। কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধিকার আন্দোলন রূপ লাভ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে। স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের পরিস্থিতি টালমাটাল হয়ে ওঠে। ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটাররাও দেশের সংকটময় মুহূর্তে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ২৫শে মার্চে পাকিস্তানি বাহিনী অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায়। শুরু করে গণহত্যা। বাঙালি এর আগে এমন হত্যাকাণ্ড দেখেনি। তাই প্রথমে এমন নৃশংস গণহত্যা দেখে থমকে গিয়েছিল। চমকে উঠেছিল স্বজনের রক্ত দেখে। শোকে শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। পরক্ষণেই শোককে শক্তিতে পরিণত করে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ায় সমগ্র বাঙালি জাতি। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় একদিন বাচ্চু মিয়া সংবাদ পেলেন তার স্ত্রী অসুস্থ। বাচ্চু মিয়ার স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। ১৩ই এপ্রিল অন্তঃসত্ত্বা অসুস্থ স্ত্রীর খোঁজখবর নিতে শ্বশুরবাড়ি সোহাগপুর গ্রামে যান। স্ত্রীকে একনজর দেখেই পরদিন সকালে কর্মস্থলে ফিরে যাবার কথা ছিল বাচ্চু মিয়ার। স্ত্রীকে দেখতে গিয়ে দেখতে পেলেন স্ত্রী প্রসববেদনায় কাতর হয়ে পড়েছেন। এই কঠিন সময় স্ত্রীর পাশে থাকা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু দেশের ভেতরে শুরু হয়েছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দেশের এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ববোধ থেকে কর্মের টানে কর্মস্থলে চলে যাবার মনস্থির করেন তিনি।

এদিকে বাচ্চু মিয়ার স্ত্রী সখিনা বেগম প্রসববেদনায় ছটফট করছেন, স্ত্রীর চোখে উৎকণ্ঠা মুখে বিষণ্নতার ছাপ দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। এই অবস্থায় বাচ্চু মিয়া জানতে পারেন যে, পাকিস্তানি বাহিনী আশুগঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অপরদিকে মেজর নাসিম এক কোম্পানি সৈনিক নিয়ে আশুগঞ্জে অবস্থান করছেন। আর মেজর মতিউর রহমান ভৈরব ব্রিজের কাছে ঘাঁটি করে অপেক্ষা করছেন হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য। ইত্যবসরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের জন্যে মেজর কে এম শফিউল্লাহ এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ইত্যবসরে মেজর কে এম শফিউল্লাহ ময়মনসিংহ থেকে এক ব্যাটালিয়ন সৈনিক নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে আসেন। এ সংবাদ পেয়ে সিলেটের তেলিয়াপাড়া থেকে দ্রুত ছুটে আসেন মেজর খালেদ মোশাররফ। একত্রিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্মিলিতভাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা।

১৪ই এপ্রিল। পাকিস্তানি বাহিনী বিমান থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গুলি করতে থাকে। ফলে বেশকিছু জনসাধারণ এবং বাঙালি সৈনিক নিহত হন। তখন মেজর খালেদ মোশাররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সৈনিকদের আখাউড়া চলে যাবার নির্দেশ দেন। এমন সময় পাকিস্তানি বাহিনী প্যারাট্রুপার ফেলে আশুগঞ্জের পেছনের দিক

থেকে বাঙালি সৈনিকদের আক্রমণ করে। এর ফলে আশুগঞ্জে অবস্থানরত মেজর নাসিমের বেশকিছু সৈনিক শহিদ হন। মেজর নাসিমের নেতৃত্বে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাঙালি সৈনিকরা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত হানাদার বাহিনী আশুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিমান আক্রমণ চালায়।

১৩ই এপ্রিল ফায়ার ফাইটার মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে দেখতে শ্বশুরবাড়ি আসেন। আশুগঞ্জের সোহাগপুর শ্বশুরবাড়িতে রাত্রিযাপন করেন। ভোর বেলায় হানাদার বাহিনী বাঙালি সৈনিকদের ওপর আক্রমণ করে। পাকিস্তানি বাহিনীর এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য রেললাইন ধরে ভৈরবের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দেশের এমন পরিস্থিতি দেখে মোহাম্মদ বাচ্চু মিয়া তাড়াতাড়ি কর্মস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। আশুগঞ্জের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তার স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন অফিসে যেতে বারণ করেন। একদিকে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর প্রসববেদনা, অপরদিকে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মলাভের যন্ত্রণা। এসব চিন্তা-ভাবনা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। স্ত্রীকে দেখভাল করার জন্য শাশুড়ির কাছে দায়িত্বভার দেন। তারপর দেশের জান-মাল রক্ষার জন্য কর্তব্যের টানে অফিসের উদ্দেশে রওয়ানা হন। মাতৃভূমির দুর্দিনে প্রিয়জনের বাধা-নিষেধ পেরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন বাচ্চু মিয়া। তখন বাংলার আকাশ থেকে হানাদার বাহিনীর জঙ্গি বিমান থেকে আক্রমণ চলছিল। অপরদিকে বীর বাঙালি সৈনিকরা পাল্টা আক্রমণ করে। সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর গুলিতে সেদিন শহিদ হয়েছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর সেনানী সুবেদার সিরাজুল ইসলাম, ল্যান্সনায়েক আব্দুল হাই, সিপাহি আব্দুর রহমান সরকার, সিপাহি কফিল উদ্দিন প্রমুখ।

যুদ্ধে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পায়ে পায়ে মৃত্যু তাড়া করতে থাকে। মৃত্যুভয়ে দেশমাতৃকার এই বীর শহিদদের সেদিন দাফন করা সম্ভব হয়নি।

আশুগঞ্জ বাচ্চু মিয়া দেখতে পেলেন হানাদার বাহিনীর তাণ্ডবলীলা। আশুগঞ্জ-ভৈরব অঞ্চল দখল করতে পাকিস্তানি বাহিনী আকাশপথে জঙ্গি বিমানে আক্রমণ চালায়। বাঙালির স্বাধীনতা স্বপ্নকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে মেতে ওঠে বুনো পৈশাচিকতায়। বাচ্চু মিয়া সোনাপুর গ্রামের কাছাকাছি আসতেই বোমার আঘাতে তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। রক্তাক্ত দেহে তিনি লুটিয়ে পড়েন স্বদেশের মাটিতে। ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।

বাচ্চু মিয়া ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ফায়ার ফাইটার। দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে নিজের দায়িত্ববোধে ছুটে চলেন কর্মস্থলের দিকে। কেননা, হানাদার বাহিনী নির্বিচারে জ্বালাও-পোড়াও আর হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছে। বাচ্চু মিয়া একজন অগ্নিসৈনিক। যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে জান-মাল উদ্ধার করাইতো তার কর্তব্য। সেই কর্তব্য টানে জীবন বাজি রেখে রওয়ানা হন কর্মস্থলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য পথিমধ্যে শত্রুর বোমার আঘাতে হারাতে হলো তার অমূল্য জীবন। তখন দেশের পরিস্থিতি এতটাই সংকট হয়ে উঠেছিল যে, বাচ্চু মিয়ার লাশ দাফন করা সম্ভব হয়নি। এই দেশপ্রেমিক ফায়ার ফাইটারের লাশ জানাজা ছাড়াই মাটিচাপা দেওয়া হয়। প্রিয়জন দেখতে পায়নি তার লাশ।

বাচ্চু মিয়ার মৃত্যুর পর ভূমিষ্ঠ হয় তার একটি পুত্রসন্তান। হায়রে নিয়তি। দেশপ্রেমিক এই ফায়ার ফাইটারের দেখা হলো না তার নবজাতক শিশুপুত্রের নির্মল মায়াবী মুখখানি। নবজাতক সন্তানটিও জন্মের পর দেখতে পেল না তার জন্মদাতা পিতার পবিত্র মুখ। মুক্তিযুদ্ধ এক রক্তাক্ত অধ্যায়, এক বেদনার ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধ আর তার বাবা একই সূত্রে গাঁথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ছেলেটি জন্মেছিল, সে ছেলেটির বয়স এখন স্বাধীনতার সমান।

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক, miajankabir@gmail.com

বিদ্রোহে বিপ্লবে বিজয়ী বাঙালি

আব্বাস উদ্দিন আহমেদ

জাগবে সাড়া বিশ্বময় এ বঙ্গভূমি নিঃস্ব নয় জ্ঞান-গরিমা, শক্তি সাহস আজও এদের হয়নি শেষ। এমন তেজোদীপ্ত অভিব্যক্তি যে-জাতির তাদের বিদ্রোহে-বিপ্লবে বিজয়ী না হবার কোনো হেতু থাকতে পারে না। যুগে-যুগে এদেশের সংগ্রামী জনতা রক্ত দিয়ে ও জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই সুস্পষ্ট স্বাক্ষর মেলে। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী তা-ই তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন–

১৫৮৭ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে বাংলাদেশ পুরোপুরি স্বাধীনতা হারায়। তৎকালীন মুঘল প্রশাসন বাংলাদেশের চাষিদের দখলিস্বত্ব মেনে নিয়েছিল এই আশঙ্কায় যে, চাষি নির্দিষ্ট জমি ছেড়ে অন্যত্র যেন চলে না যায়। সেকালের নীচু মানের জীবনযাত্রা আর কুঁড়েঘর ছাড়া এমন কোনো স্থাবর সম্পত্তি চাষির ছিল না, যা তাকে পুরানো ভিটেয় আটকে রাখতে পারে। তাই দুর্ভিক্ষ কিংবা শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বসবাস পরিবর্তন ছিল মুঘল যুগের চাষিদের জবাব। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে চাষাবাদের পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তনের অভাবে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে শেষ অবধি জমি বিরল আর মানুষ অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি ইংরেজ শাসনের শুরুতেই বাংলাদেশের বস্ত্র ও কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করা হয়।

একদিকে কৃষি সংকট, অন্যদিকে যথেচ্ছ রাজস্ব আদায়ে কৃষকদের তীব্র প্রতিবাদ ও দুর্বার প্রতিরোধ ধীরে ধীরে রূপ নেয় রক্তাক্ত বিদ্রোহে। ইতিহাসের কালানুক্রমে আসে বাঙালির বিদ্রোহের সোপান বেয়ে– ১৭৬৩ থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল এদেশের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যার নাম দেয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এভাবে বিচিত্র সাজে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় বিদ্রোহ —

- মেদিনীপুরে আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ (১৭৬৬–'৮৩)
- কুমিল্লার কৃষক বিদ্রোহ (১৭৬৭–'৬৮)
- সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৬৯, ১৮১৯, ১৮৭০)
- তাঁতি বিদ্রোহ (১৭৭০–'৮০)
- চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬–'৮৭)
- নীলচাষি বিদ্রোহ (১৭৭৮–১৮০০, ১৮৩০–'৪৮, ১৮৫৯–'৬১)
- লবণচাষি বিদ্রোহ (১৭৮০–১৮০৪)
- রেশমচাষি বিদ্রোহ (১৭৮০-১৮০০)
- রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩)
- যশোর-খুলনায় কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৪–'৮৬)
- বীরভূমে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৫–'৮৬)
- বীরভূমের বাঁকুড়ায় আদিবাসী বিদ্রোহ (১৭৮৯–'৯১)
- বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ (১৭৯২)
- ময়মনসিংহে গারো বিদ্রোহ (১৭৭৫–১৮০২, ১৮৩৭–'৮২)
- ময়মনসিংহ কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২ ও ১৮৩০)
- মহাবিদ্রোহ বা সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭)
- সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ (১৮৬১)
- সিরাজগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২–'৭৩)
- কুমিল্লায় কৃষক বিদ্রোহ (১৯২৮–'৩১)

- কিশোরগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ (১৯৩০)
- তেভাগা কৃষক বিদ্রোহ (১৯৪৬–'৪৭)

সবই ছিল বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার ফল ও ফসল। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা লাভ করি শহিদদের রক্তস্নাত সংবিধান; যদিও বেশ ক'বার কালিমালিপ্ত হয়েছে শাসকদের হাতের ছোঁয়ায়। বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশকে নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের নির্মোহ বিবেচনা ও বিপ্লবী পটভূমির চুলচেরা বিশ্লেষণে শেকড়সহ উঠে এসেছে ঐতিহ্যের নানা দিগন্ত– যখন সভ্য উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য-জৈন-বৌদ্ধ-ধর্ম সংস্কৃতির ও ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটল, তখন থেকেই তাদের প্যাগান জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি ক্রমে অপসৃত হতে থাকে। শূদ্র নামে অভিহিত, অবজ্ঞাত রাঢ়-পুণ্ড্রের পাটলি পুত্রস্থ শাসকগোষ্ঠীর কবলিত হয়ে। ক্রমে এখানকার বাংলাভাষী অঞ্চলের মানুষ বঙ্গবহির্ভূত শক্তির শিশু নাগ, মৌর্য, শুঙ্গ, কান্ব, গুপ্ত, পাল, চন্দ্র, বর্মণ, খড়্গ, দেব, কোচ, সেন, তুর্কি, মুঘল, ইংরেজ আঞ্চলিক বা সামগ্রিক শাসনে-শোষণে-পীড়নে আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারিয়ে দাসসত্তার নিরাকাঙ্ক্ষ নিরুদ্যম গ্লানির মধ্যে প্রাজন্মিক আবর্তন পেয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে।

এই মিশ্র বা সংকর সংস্কৃতির মানোন্নয়নে ব্যক্ত হয়েছে গবেষকদের প্রাজ্ঞ অভিমত।

সংস্কৃতি বহতা নদীর মতো প্রবহমান– গতিশীল। নতুন-নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির প্রবাহ সচল থাকে। সেই চলমানতার প্রয়াস চালালে, নতুন সৃষ্টি দিয়ে কিংবা কল্যাণকর অনুকৃতি দিয়ে সংস্কৃতিকে সজীব রাখতে পারলেই আমরা কল্যাণ বুদ্ধির পরিচয় দেবো। সৃষ্টির ধারায় নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর সকল জাতির সকল রাষ্ট্রের মহত্তর যা কিছু তা গ্রহণ করে নিজেদের সৃষ্টি শক্তিকে বিকশিত করতে হবে।

যখনই কোনো স্বার্থান্বেষী শাসক জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে কিংবা স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে শাসক শ্রেণি কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে, তখনই অমিত শক্তিধর এদেশের ছাত্র-যুব-জনতা সম্মিলিত শক্তি নিয়ে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে বিচিত্র রঙে-ঢঙে আবির্ভূত হয়ে ক্ষমতার তখত-তাউস থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে ছেড়েছে। আমাদের দেশে সম্প্রতি সংঘটিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানোত্তর বিজয়ে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। কেননা তিন সহস্রাব্দের এ প্রজন্ম হবে মননে-চেতনে সর্বাধুনিক-সর্বোন্নত-সর্বানুসন্ধিৎসু। বিদ্রোহে বিজয়ে বিপ্লবী বাঙালি 'চির উন্নত মম শির'– বিদ্রোহী কবির এই দৃপ্ত চেতনা চির সমুন্নত রাখতে এদেশের সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্ম সদা বদ্ধপরিকর।

আব্বাস উদ্দিন আহমেদ: শিক্ষক, লেখক,গবেষক, ঝিনাইদহ

দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কালিয়াকৈর অঞ্চলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ সরকার ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর মধ্যে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে 'Southern Chattogram and Kaliakoir Transmission Infrastructure Development Project' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে AIIB এর সঙ্গে ১০৯.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২৯.৪২ মিলিয়ন ইউরো এবং ১৩২.৪৯ মিলিয়ন আরএমবি মুদ্রায় ঋণচুক্তি, প্রকল্প চুক্তি ও External Debt Letter স্বাক্ষর হয়।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মিরানা মাহরুখ, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং AIIB'র পক্ষে Rajat Misra, Acting Vice President for Investment Clients Region I and Financial Institutions and Funds, Global (VP IC1) and Director General, Public Sector Clients Department Region-1 (PSC1) ঋণচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং Project Agreement টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি এর পক্ষে এস.এম. জাফরুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি স্বাক্ষর করেন।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের দক্ষিণ চট্টগ্রাম এবং কালিয়াকৈর অঞ্চলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সক্ষমতা উন্নত করা।

প্রতিবেদন: সাগর ইসলাম

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা শুরু করলেই প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের কথা চলে আসে। ১৯৭১- এর নয়টি মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে বাঙালি স্বাধীনতাকামী সেই যোদ্ধাদের। ৩০ লাখ মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতা। সেই সাথে চলে আসে ২ লাখের বেশি মা-বোনের সম্ভ্রমহানি, অসংখ্য নারীর উপর অমানবিক নির্যাতন, যন্ত্রণা ও ত্যাগের কথা। আজ আমরা স্বাধীন দেশে বসবাস করছি, স্বাধীনতা লাভের আনন্দে খুশিতে আত্মহারা হচ্ছি। অথচ আত্মত্যাগী সেই মা-বোনেরা এই দেশে আছে মাথা নিচু করে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও কিন্তু অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পরপরই পশ্চিমা সরকারের পূর্ব বাংলার জনগণকে নিচু করে দেখা এবং তাদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থভাব প্রকাশ করায় পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে লড়তে থাকে। সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেই এর সূচনা ঘটে। এরপর ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বারা এর অবসান হয় দেশ স্বাধীনের মাধ্যমে। এর প্রতিটি মাধ্যমেই নারীদেরও কিন্তু বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাঙালি জাতি গভীর সংকটে নিমজ্জিত হন পাক-হানাদারদের নিপীড়ন ও বর্বর অত্যাচারে। তাদের মধ্যে বাংলার নারীরা বেশি দুর্ভোগের শিকার হন। ১৯৭১-এর যুদ্ধে নারীসমাজের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। বাঙালি পুরুষরা যখন পাড়া মহল্লা, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর থেকে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন যাওয়ার সময় মা-বোন-স্ত্রীরা টাকা-পয়সা, সোনা-দানা দিয়ে তাদের সহায়তা করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধে অবস্থান কালে বিভিন্ন জায়গায় হাজির হলে বাংলার নারীরা তাদের খাওয়া-দাওয়া, তথ্য দেওয়া ও বিশ্রামসহ আহতদের সেবা দিয়ে সাহায্য করত। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে অনেক মা-বোন-স্ত্রীরা পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও রাজাকার-আলবদর-আলসামসদের কাছে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবুও নারীরা ঝুঁকি নিয়েও

নিজের সন্তানদের, নিজের স্বামীদের, নিজের ভাইদের যুদ্ধে যাওয়ার উৎসাহ দিয়েছেন। এমনকি বৃদ্ধ মায়েরা ও বোনেরা ভিক্ষুক সেজে পাক-হানাদার ক্যাম্প থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জানাতেন। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দলে সেবিকার কাজ করেছেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন, কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রান্নার দায়িত্বও পালন করেছেন।

শুধু পরোক্ষভাবে নয় প্রত্যক্ষভাবেও নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ থেকে শুরু করে সম্মুখ যুদ্ধ সবই করেছেন। তারা বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র এগিয়ে দেওয়া, তাদের খাবারের ব্যবস্থা, আগাম গোপন তথ্য

আদানপ্রদান পর্যন্ত করেছে জীবন বাজি রেখে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন নানা নির্যাতন, যন্ত্রণা, পাক-হানাদারদের শত বর্বরতার মধ্যেও বাংলার মা-বোনেরা সকলে কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন। এই সহায়তা করতে গিয়ে নির্যাতিত হয়ে অনেকে জীবন দিয়ে শহিদ হয়েছেন। বাংলার বীরাঙ্গনা হয়ে এখনো কেউ কেউ বেঁচে আছেন। কেউবা গুলি ও বোমার আঘাতে হাত পা ভেঙে পঙ্গু হয়েছেন। অনেক নারী গুলিবিদ্ধ হয়েও হানাদারবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়েছেন। এই তথ্য অনুযায়ী হানাদারদের ক্যাম্প আক্রমণ করা হয়েছিল। এভাবেই বাংলার মা-বোনেরা-স্ত্রীরা মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন।

বাঙালি নারীরা রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘরে বাইরে থেকে সচেতনতার সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও আন্দোলন করে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও বেগম রোকেয়ার মতো অনেক নারীই রাজনীতি ও সমাজনীতিতে এগিয়ে আসেন পুরুষের পাশাপাশি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ও নারীর ভূমিকা ছিল। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধেও নারীদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে মুক্তিযুদ্ধের সেই ৯ মাসে নারীদের অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবে না। ১৯৭১-এর ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার সভায় রোকেয়া হলের ছাত্রীরা মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের ব্যানার, ফেস্টুনে লেখা ও স্লোগান ছিল 'মা-বোনেরা অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ মুক্ত কর', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা' ইত্যাদি। সেই দিন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শত শত ছাত্রী বটতলার মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন এবং দেশ স্বাধীনতার শেষ অবধি তারা এই লড়াইয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাদের এই সাহসী ভূমিকা জাতি আজও স্মরণ করছে।

নারীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বিভিন্ন কৌশলে প্রশিক্ষণ দেন। ব্যারিকেড সৃষ্টি, আত্মরক্ষার্থে শত্রুর গায়ে মরিচের গুড়া নিক্ষেপ, গ্রেনেড নিক্ষেপ, বন্দুক চালানো এ ধরনের বিভিন্ন ট্রেনিং তারা নেন। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাহাড় ঘেরা নির্জন এলাকায় ও বাড়িতে নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পুলিশ কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ নারীরা এই প্রশিক্ষণ দিতেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসেই ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের বন্দুক হাতে নিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রথম সশস্ত্র বিগ্রেড তৈরি করেন একজন নারী কমান্ডার।

তারপর তাদের রাইফেল চালানো, শরীর চর্চা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ব্যারিকেড তৈরি শিক্ষা দেওয়া হয়। ঢাকার রাজারবাগ, কলাবাগান ও ধানমণ্ডিসহ বিভিন্ন স্থানে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তৎকালীন নারী কর্মীরা এই ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেওয়া হতো। তখন বাংলার অনেক মা-বোনেরা মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহী হয়ে পড়েন। তাই কলকাতার গোবরায় একটি মহিলা ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হয়। প্রয়াত সাজেদা চৌধুরী ঐ ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন। ৪০০ নারী যোদ্ধাকে ঐ ক্যাম্পে ট্রেনিং দেওয়া হয়। নারীর সাহসিকতা, দেশ প্রেম ও রাজনৈতিক চেতনা পরখ করেই এই ট্রেনিং দেওয়া হতো। তাদের আহত যোদ্ধাদের সেবাদান করা ছিল ফার্স্ট ট্রেনিং। এরপর দ্বিতীয় ট্রেনিং সশস্ত্র যুদ্ধের। ভারতীয় অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা এই ট্রেনিং দিতেন। ১৬ জন করে ৪৮ জনকে ৩টি গ্রুপে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি সচেতন নারীরাও এগিয়ে আসে। তারা ছদ্মবেশ ধারণ করে পুরুষের শার্ট-প্যান্ট পরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শিরিন বানু মিতিল এমনই একজন নেত্রী। যিনি যুদ্ধের সময় পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়া অবস্থায় যুদ্ধে যোগ দেন পুরুষ বেশে। তিনি পাবনার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস দখল করে ৩৬ জন পাক-হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন একমাত্র নারী হিসেবে। সেদিন ৩৬ জন পাক আর্মিই মারা গিয়েছিল। আরেক নেত্রী সেই সময়ের ঢাকা ভার্সিটির রোকেয়া হলের ছাত্রী ফোরকান বেগম। তিনি আগরতলায় প্রশিক্ষণ দেন। গেরিলা ও সুইসাইড স্কোয়াডের প্রশিক্ষণ নেন তিনি। মহিলাদের গেরিলা ও সুইসাইড স্কোয়াডের প্রশিক্ষণ দেন এই ফোরকান বেগম। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি ওরফে নূরজাহান ২০টির বেশি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জোগান দেওয়া থেকে শুরু করে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন। আরেক বীর নারী যোদ্ধা তারামন বিবি যুদ্ধে অংশ নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের পরাস্ত করেন। পাকবাহিনী তাদের ক্যাম্প আক্রমণ করলেও কৌশলে বেঁচে যান তিনি। অন্য দুজন যোদ্ধা বিথীকা ও শিশির কণা ভারতে ট্রেনিং নিয়ে গ্রেনেড দিয়ে শত্রুর গানবোট ভেঙে চুরমার করে দেয়। এভাবেই নারীরা শত্রু শনাক্ত ও তাদের ব্যবহৃত গোপন কোড ও সামরিক সরঞ্জাম চিহ্নিত করে আক্রমণ চালাতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাই তাদের অবদান গুরুত্ববহ ও বীরত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের মধ্যে কেউ সরাসরি অংশগ্রহণ করেন আবার কেউ পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। নানারকম কৌশল দ্বারা ভেতর-বাহিরের খবর আদান-প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তারা। দেশ স্বাধীনতার পর সরকার নারী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছিল। বিভিন্ন তথ্য থেকে তা সংগ্রহ করেছেন। তথ্যানুযায়ী নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বেগম সুফিয়া কামাল, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, জাহানারা ইমাম, মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি, ডাক্তার ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, গীতা মজুমদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি, বীর মুক্তিযোদ্ধা বীথিকা বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা শিরিনবানু মিথিল, আলেয়া রেগম, মেহরুননেসা, হালিমা খাতুন, আলমতাজ বেগম, করুনা বেগম, শিশির কনা, ফোরকান বেগম প্রমুখ। সরকার কর্তৃক খেতাব প্রাপ্ত ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ২ জন বীর প্রতীক নারীও আছেন। তারা হলেন মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি ও ডাক্তার ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম।

শুধু অস্ত্র দিয়ে নয় সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা প্রেরণা দিয়েছেন নাটক ও সংগীতের মাধ্যমে। এদের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সন্‌জীদা খাতুন, শেফালী ঘোষ, লায়লা হাসান, শাহীন সামাদ, ডালিয়া নওশীন, রমা ভৌমিক, রূপা খান, মাধুরী আচার্য, বুলবুল মহলানবীশ, অরুণা সাহা, কল্যাণী ঘোষ, মঞ্জুলা দাশগুপ্ত, স্বপ্না রায়, নমিতা ঘোষ, ফ্লোরা আহমেদ, আফরোজা বেগম, বুলা মাহমুদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তারা মুক্তির গানের মাধ্যমে, নাটকের মাধ্যমে, আবৃত্তির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন। তারাও মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, যৌন অপরাধ ও মানসিক যন্ত্রণা ছিল পাক-হানাদারবাহিনীর একটি পরিকল্পিত বিষয়। সাধারণভাবে দখল দারিত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে বাঙালি জাতিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার জন্যই হানাদাররা নারীদের বেছে নেন। কারণ প্রচলিত ভাবধারা অনুযায়ী নারীর অভিভাবক হিসেবে পুরুষরাই থাকে। তাদের হেয় করার জন্যই নারী তথা মা-বোনদের উপর ওরা নির্যাতন করে। নারীরাই এই যুদ্ধ কৌশলের শিকার হন।

শুধু রণাঙ্গনের লড়াইয়ে নয়, অভাব আর অনিশ্চিয়তার মধ্যেও অনেক নারীরা পেছন থেকে সংসার টিকিয়ে রেখেছেন সংগ্রামের মাধ্যমে। কারণ তাদের পুরুষরা তখন মুক্তিযুদ্ধে চলে গিয়েছিল, গ্রাম ছিল পুরুষশূন্য। এই নারীরাই তখন সংসারের হাল ধরেছেন। তাই বলা যায়, মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারীর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

দেশ স্বাধীনের পর মুক্তিযোদ্ধারা যে সম্মানটুকু পেয়েছে, তাদের অবদানের জন্য। সেখানে যে সকল মা-বোনেরা তিলে তিলে জীবন দিয়েছেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মিলিটারিদের নির্যাতনে, যারা ক্যাম্পে মাসের পর মাস অমানবিক নৃশংসতার শিকার হয়েছেন, তাদের জীবন নষ্ট হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর তখন দেশে এলোমেলো অবস্থা বিরাজ করছিল। সরকারও সাথে সাথে তাই নির্যাতিতাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসেছিলেন ড. নীলিমা ইব্রাহিম, বেগম সুফিয়া কামাল ও মালেকা খানের মতো নেত্রীরা। বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে তখন ১৯টি জেলায় তাদের জন্য সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। যুদ্ধশিশু জন্মের পর তাদের নিয়ে সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। সুফিয়া কামাল, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, মালেকা খানসহ অনেকেই সেই পরিস্থিতিতে তাদের জন্য কাজ করে গেছেন। জাতি চিরদিন তা মনে রাখবে।

নয় মাসের এই মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনতে নারীদের যে উৎসাহ, উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা ও তৎপরতা ছিল। তা পুরুষদের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। সরকার নারী মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা ও তাদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা করেছেন। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান তুলে ধরে তাদের মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন সরকার। অনেকেই চাকরি, জমি ও বাড়ি পেয়েছেন। আমরা আত্মত্যাগী সকল মা-বোনদের মর্যাদা দিতে পেরে আজ গর্বিত। এই সকল মা-বোনদের সম্মান জানাতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

মোহামদ নজরুল হাসান ছোটন: সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

বিআরটি করিডোরে বিআরটিসি এসি বাস সার্ভিসের উদ্বোধন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)-এর পরিচালনায় ১৫ই ডিসেম্বর শিববাড়ি, গাজীপুর বিআরটি লেনে বিআরটিসি এসি বাস উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহণ ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক।

প্রাথমিকভাবে ১০টি বিআরটিসি এসি বাস গাজীপুরের শিববাড়ি বিআরটি টার্মিনাল থেকে বিআরটি লেনে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২০ দশমিক ৫ কিলোমিটার এবং এয়ারপোর্ট থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার মোট ৪২ দশমিক ৫ কিলোমিটার পথ চলাচল করবে। শিববাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ভাড়া ৭০ টাকা এবং শিববাড়ি থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত ভাড়া ১৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যাত্রী চাহিদা এবং স্টেশনসমূহ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাসের সংখ্যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা হবে।

প্রতিবেদন: আলেয়া রহমান

শহিদ মুখতার ইলাহি ও শহিদ আবুল কাশেম মিঞা হোক তরুণদের চেতনা

হেলাল হোসেন কবির

প্রকৃতির কারণে কিছু চিন্তাশীল মানুষ জন্মায়। কেউ ইতিহাস রক্ষা করে, কেউ ইতিহাস বদলায়। বাংলাদেশ জন্মাবার পেছনে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের দাগের ঢেউ লেগে আছে মানচিত্র জুড়ে। জীবন বাজি রেখে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে। ১৯৭১ সাল আমাদের জন্য মুক্তির স্বাদ যেমন এনে দিয়েছে, ঠিক তেমনি বহু পরিবার হয়েছে ভাই হারা, মা হারা, বাবা হারা। কেউবা চোখের সামনে দেখেছেন বোনের ইজ্জত হারাতে। সেই পরিবারগুলো এখনও হারানোর বেদনা বুকে লুকিয়ে রাখে। তবুও স্বাধীনতার স্বাভাবিক জীবন মেনে নিয়ে চলছে তারা।

মহান মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু আমাদের শিখিয়েছে বহুকিছু। মানুষের সঙ্গে ভেদাভেদ তৈরি করলে প্রকৃতি তার জবাব দেয় মানুষ হয়ে অথবা খরা-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস হয়ে। পাকিস্তানকে জবাব দিতে মানুষের রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল। সেসময় মানচিত্রকে বাঁচাতে দামাল ছেলেরা এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন করেছে বাংলাকে।

আমাদের উত্তরের জেলা লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায় মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিল ৬ নম্বর সেক্টর। যার কারণে যুদ্ধের দামামা দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছিল এই অঞ্চলের মানুষের মাঝে। অপরদিকে এই অঞ্চল পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনীকে মোকাবিলা করতে দলবদ্ধভাবে ও খণ্ড খণ্ডভাবে গড়ে ওঠে আক্রমণ রক্ষা বাহিনী বা মুক্তিযোদ্ধা। এর পেছনে নেতৃত্ব দিতেন সমাজের নামিদামি ব্যক্তিবর্গ। তেমন একজন ছিলেন লালমনিরহাটের বড়বাড়ির আবুল কাশেম মিঞা। তিনি সেই সময় নামকরা শিক্ষক ছিলেন। দেশের ক্রান্তিকালে তিনি পরম মমতা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে থেকে সংগঠিত করেছেন। পরিবারের কথা চিন্তা না করে স্ত্রী হাবিব খাতুনের অনুপ্রেরণায় মানচিত্র রক্ষার লড়াইয়ে এগিয়ে যান শিক্ষক হয়ে। আবুল কাশেমের কাজের সঙ্গে সাথী হন সেই সময় রংপুর কারমাইকেল কলেজের ভিপি মুখতার ইলাহি। মুখতার ইলাহিও ছুটে আসেন শিক্ষক আবুল কাশেমের পাশে। কুড়িগ্রাম ঢুকার প্রবেশ পথ লালমনিরহাটের বড়বাড়ির আইরখামার এলাকা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেই এলাকাজুড়ে মানুষকে একতাবদ্ধ করে হানাদার বাহিনীকে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করা হয়। যার কারণে পাকিস্তানি বাহিনীর সেখানে বার বার ব্যর্থতার নিশানা হয়ে যায় আইরখামার এলাকাটি। ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী ৯ই নভেম্বর ন্যক্কারজনকভাবে গণহত্যা চালায়। পাকিস্তানি বাহিনীর সামনে বুক উঁচিয়ে দাঁড়ান মুখতার ইলাহি ও আবুল কাশেম মিঞা। দুজনের সাহসিকতা দেখে পাকিস্তানি বাহিনী অনেকটা ঘাবড়ে যায়। খুব নির্মম ছিল এই গণহত্যা। সেই গণহত্যায় শহিদ হন এক এক করে প্রায় শতজন মানুষ। অকুতোভয় দুঃসাহসী মানুষগুলোর দেহের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় গোটা আইরখামার। কে ছিলেন মুখতার ইলাহি ও আবুল কাশেম মিঞা, এবার আসুন জেনে নিই।

শহিদ মুখতার ইলাহি

রংপুর কারমাইকেল কলেজের ভিপি খন্দকার মুখতার ইলাহি। ডাক নাম ছিল চিনু। সেখানে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে নতুন করে অনার্সে ভর্তি হন ইংরেজি সাহিত্যে। সেকেন্ড ইয়ারে উঠবার কিছু দিনের মধ্যেই এসেছিল ছাত্র সংসদের নির্বাচন। সংসদে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ছাত্র সংস্থা নামে একটি দল থেকে খন্দকার মুশতাক ইলাহি। মুশতাক ইলাহি ছিলেন একদিকে যেমন তুখোড় ছাত্র, অন্যদিকে তেমনি অসাধারণ বক্তা। ইংরেজি সাহিত্য

নিয়ে অনার্স করলেও তাঁর ছিল বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ টান। রংপুরের ধাপ এলাকার সর্বজন পরিচিত মেধাবী ইলাহি পরিবারের ভাইদের মধ্যে মুখতার ইলাহি ছিল কনিষ্ঠতম। তাঁর ভাই মুশতাক ইলাহিকে সকলে এক নামে চিনত। দুই ভাইয়ের চেহারাতেও ছিল আশ্চর্য মিল। সেসময় কলেজ ক্যাবিনেটের অন্যতম পদপ্রার্থী হিসেবে উঠে আসে মুখতার ইলাহির নাম। তাঁর প্রার্থিতা ছিল ম্যাগাজিন সেক্রেটারি পদে। আর তাঁর বড়ো ভাই মুশতাক ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। অনুজ

মুখতারকে নিয়ে সেবার ছাত্র সংস্থা জিতেছিল প্রায় পুরো প্যানেলেই। মূলত মুখতার ইলাহিকে জায়গা করে দেন বড়ো ভাই মুশতাক, প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন মেডিকেল কলেজে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকদের রাজনৈতিক রোষানল তাঁকে বহিষ্কৃত করেছিল সেখান থেকে। এরপর তিনি কারমাইকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন বিএসসি ক্লাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স করার সময় থেকে যোগ দেন সাংবাদিকতা পেশায়। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি কাজ শুরু করেন *বাংলার বাণী* পত্রিকায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি শেষে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে থাকেন। যাই হোক, ১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনের উত্তাল দিন। এর মধ্যেই এসেছিল ছাত্র সংসদের নির্বাচন। কলেজজুড়ে তো বটেই ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়িও চলছিল প্রচারণা। স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ববর্তী ছাত্র সংসদের নির্বাচনে বিজয় ঘটল মুখতার এলাহির। তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেন ভিপি পদে। মুখতার ইলাহির নাম নতুন রূপে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে ইয়াহিয়ার ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্ররা এবং অগণিত মানুষ হাজির হয় রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি ময়দানে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অন্যতম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কারমাইকেল কলেজের ভিপি মুখতার ইলাহি। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রংপুর অঞ্চলে যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর সহযোগীদের নিয়ে প্রায়শই ঢুকে পড়ত অভ্যন্তরে। ছাত্রনেতা হয়েও দেশের জন্য সংগঠিত করতে ছুটে চলেন তিনি। তাঁদের এই চলাচলের খবর স্থানীয় রাজাকাররা জানিয়ে দেয় হানাদার বাহিনীর কাছে। দেশ মুক্ত হওয়ার মাত্র এক মাস আগে ৯ই নভেম্বর মুখতার ইলাহির রক্তে রঞ্জিত আইরখামারের মাটি। বাংলাদেশের মানচিত্র তৈরি হয় রক্তের বিনিময়ে।

শহিদ আবুল কাশেম মিঞা

১১ ছেলেমেয়ে রেখে দেশের জন্য জীবন দেন শহিদ আবুল কাশেম মিঞা। তখনও কোনো সন্তানের লেখাপড়া শেষ হয়নি। সন্তানদের পরম মমতা-স্নেহ দিয়ে বড়ো করলেও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ রেখে চলে যান। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ৯ই নভেম্বর ১৯ রমজানে পাকিস্তানি-হানাদার বাহিনী কর্তৃক তিনি নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। মাত্র ৪৯ বছরের এই ক্ষণজন্মা মানুষটির জীবন ছিল বর্ণাঢ্য। প্রতিকূল পরিবেশে জীবন সংগ্রামে এক বিজয়ী পুরুষ। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন জীবনের চেয়ে দেশ অনেক বড়ো। ব্যক্তিগত জীবনে পেশা ছিল শিক্ষকতা। তিনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে বড়বাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আজীবন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পাঙ্গা রানী লক্ষ্মী প্রিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্কুল জীবনে প্রায় ২২/২৩ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে লালমনিরহাট মডেল স্কুলে লেখাপড়া করে সেখান থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাস করেন। পরবর্তীতে কোচবিহার কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আইএ

পাস করেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ব্রিটিশ আমলে বিএ পাস করেন। পরবর্তীতে এলএলবি সমাপনী পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর বড়ো ভাইয়ের (উনি ছিলেন তাঁর অভিভাবক) মৃত্যুর কারণে পরীক্ষা না দিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে আসেন। আবুল কাশেম ছোটোবেলায় তাঁর পিতামাতাকে হারান। তাঁর বড়ো ভাই ডা. নাদের হোসেন তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেন। আবুল কাশেম অত্যন্ত দরদ ও ভালোবাসা দিয়ে এলাকার মানুষের সেবা করতেন। সে কারণে তাঁর ব্যক্তিগত ভক্ত হয়ে ওঠে বহু মানুষ। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের অংশগ্রহণে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সবসময় আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতেন। রাতের আঁধারে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তাদের মনে সাহস জোগাতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকায় পাকিস্তানি-হানাদার বাহিনী তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। তাঁর এক ছেলে তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক উপমন্ত্রী ও বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু। বাবার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য বড়বাড়ি শহিদ আবুল কাশেম উচ্চ বিদ্যালয় এবং শহিদ আবুল কাশেম মহাবিদ্যালয় দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সন্তানরা। প্রতিবছর ৯ই নভেম্বর বড়বাড়ি ইউনিয়নের পূর্ব আমবাড়ি গ্রামে শহিদ আবুল কাশেমের কবরে দোয়া ও শ্রদ্ধা জানায় এলাকাবাসী। সেখানে প্রবীণ ও তরুণদের উপস্থিতিতে তৈরি হয় শ্রদ্ধাঞ্জলির মিলনমেলা।

সর্বোপরি, শহিদ মুখতার ইলাহি ও শহিদ আবুল কাশেম মিঞা আমাদের তরুণসমাজের জন্য নতুন চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বেঁচে থাকুক। এই কামনা করি কায়মনোবাক্যে।

হেলাল হোসেন কবির: কবি, সাংবাদিক ও নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আলোর মনি, লালমনিরহাট, helalhossiankabir@gmail.com

লোকটা এখনো দৌড়ুচ্ছে

রফিকুর রশীদ

কী যে জ্বালা হয়েছে, বাদল প্রামাণিকের চোখে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। গ্রামের লোকে বলে পরামানিক। তার পেশাগত পরিচয় নাপিত। এ তার পৈতৃক পেশা। ক্ষৌরকর্মের এই পেশাকে খানিকটা আধুনিক করতে নিকটস্থ বাজারে নিউ মডেল হেয়ার কাটিং সেলুন খুলেছে তার ছেলে রতন।

মানুষ তবু পরামানিক বলেই চেনে-জানে। তা যে যা-ই বলুক, রতনের আয়-উন্নতিও হয়েছে সেই সেলুন থেকে। নিজেদের বাঁশের ঘরের সঙ্গে লাগিয়ে বাপের জন্যেও ঘর তুলেছে। সেখানে বাপও থাকে, তার সেয়ানা ছেলে মানিকও থাকে। মানিক কিছুতেই পেশাগত বংশধারা রক্ষা করতে রাজি নয়। সে পড়ে উপজেলা শহরের কলেজে। সারাদিন টো টো করে ঘুরে ঘুরে মধ্যরাতে ঘরে এসে দাদুর বিছানার পাশে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। বার্ধক্যের

ভারে ন্যুব্জ বাদল পরামানিক অনেকদিন থেকে ঘরের মধ্যে শুয়ে-বসেই থাকে।

চোখে ঘুম থাকুক আর না থাকুক, সারারাত তন্দ্রার ঘোরে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে বিছানায়। এপাশ-ওপাশ করে রাতের প্রহর পাড়ি দেয়। ক্লান্তিতে চোখের পাতা মুদে এলে তখন আবার পেচ্ছাবের চাপ হয়। ওরে বাবা, সে কী চাপ! কোনোরকমে দাঁতমুখ খিঁচিয়েও সে চাপ কখনো কখনো নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে অতি দ্রুত বিছানা ছেড়ে পায়ে চটি গলিয়ে যেতে হয় বাথরুমে। ঘর থেকে নেমে উঠোনের পুবে শানবাঁধানো কলতলা এবং তারই সঙ্গে বাথরুম। এতদূর আসতে আসতে কোনো কোনো দিন বৃদ্ধ মানুষটির লুঙ্গি নষ্ট হয়ে যায়। তখন ভয়ানক লজ্জায় পড়তে হয়। ছেলে-বউমার চোখ ফাঁকি দিয়ে লুঙ্গি পাল্টাতে হয়। তাই নিয়ে

একমাত্র নাতি মানিক খুব হাসাহাসি করে, দাদুকে চেপে ধরে শুধায়,

– আরেকটু জোরে হাঁটতে পারো না?

অভিমান-ভেজা কণ্ঠে দাদু বলে,

– আমি যে ল্যাংড়া-খোঁড়া মানুষ, হাঁটার জোর পাবো কুতায়?

বাদল পরামানিকের ডান পা সেই জন্মের পর থেকেই বাম পায়ের চেয়ে একটুখানি খাটো। ফলে আজীবন তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। আড়ালে নয়, অনেক মানুষ প্রকাশ্যেই তাকে বাদল ল্যাংড়া বলে; কষ্ট পেলেও সে কখনো প্রতিবাদ করতে পারে না। তাই বলে নিজের নাতি মানিকও এমন নিষ্ঠুর তামাশা করবে! কেমন অবলীলায় সে দাদুর মুখের উপরে বলতে পারে,

– পায়ে জোর নেই তো ঝোপজঙ্গল ভেঙে তুমি পালাও কেমন করে?

সে এক রহস্যই বটে।

এই পলায়ন-দৃশ্য অনেক পুরানো। অনেকদিন পরে সেই পলায়ন-দৃশ্য ঘুরে ফিরে আসে তার কাছে। তাকে নতুন করে তাড়া করে। সে শিউরে ওঠে, ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।

একাত্তরের দুঃসহ এক রাতে বাদল পরামানিক তার অসমান পা নিয়েই ঝোপঝাড় ভেঙে-চুরে সীমান্ত পাড়ি দেয়। স্মৃতির আয়না থেকে সেদিনের সেই রুদ্ধশ্বাস দৌড়ের ছবিটা কিছুতেই নিঃশেষে মুছতে পারে না। বছরের পর বছর সে স্মৃতি বেশ চাপা পড়েই থাকে। কিন্তু জীবনের বাঁকে বাঁকে বিশেষ কোনো কোনো সময়ে সেই দুঃসহ স্মৃতি এসে হানা দেয়। তখন কেবলই মনে হয় কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সে দৌড়ুচ্ছে প্রাণপণ, পালিয়ে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে। সম্প্রতি বেশ কদিন থেকে স্বপ্নের ভেতরে হানা দিচ্ছে সেই দৌড়ে পালানোর দৃশ্য। একমাত্র নাতি মানিক টের পেলেই স্বপ্নের ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ে সামনে দাঁড়ায়, নির্মম তামাশা করে, আজও সেই পালানোর স্বপ্ন দেখেছ দাদু?

বাদল পরামানিক কথা বলতে পারে না, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মানিক এমন দৃষ্টির তাৎপর্য বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। দাদুর কাছে জানতে চায়, তোমার এই ল্যাংড়া পায়ে তুমি পালাও কেমন করে?

প্রকৃতপক্ষে সে কোথাও পালায় না। পালানোর সে শক্তি তার দেহে নেই; কেবল আতঙ্ক লেপ্টে আছে তার চোখে-মুখে। কী যে হয়েছে ইদানীং, মানিক বাইরে থেকে আসে উত্তেজিত হয়ে, ঘরে ঢুকেই ঢাকা শহরের আন্দোলন সংগ্রামের কেচ্ছা শোনায়, ছাত্রদের আন্দোলন নাকি অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, সেই আন্দোলন থামাতে সরকার আর্মি নামিয়েছে ; এসব শুনতে শুনতে তার বুকের ভেতরে কী যে উলটপালট হয়, ঘুমের ঘোরে সে শুধুই পালিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের ঘোর ভাঙা চোখে মানিককে দেখেও সে আঁৎকে ওঠে।

বৃদ্ধ বাদল পরামানিকের পায়ে একেবারে যে শক্তি নেই এ কথা ঠিক নয়। দুই পায়ে সমতার অভাবে স্বাভাবিক হাঁটাহাঁটি বা দৌড়ঝাঁপ সে কখনোই করতে পারে না, তখন তার খুঁড়িয়ে চলাটা সবার নজরে পড়ে। প্রাকৃতিক এই প্রতিবন্ধকতার কারণে যৌবনদিনে তাকে মুক্তিযুদ্ধে নেওয়া হয়নি, নেতাদের কাছে কেঁদে-কেকিয়েও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের তীব্র আকুলতার কথা সে বুঝাতে পারেনি। নিজের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যে কত রকমেই না চেষ্টা করেছে। কিছুতেই কাজ হয়নি। মুনতাজ কমান্ডার বুঝিয়ে বলেছে– এ হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ। 'হিট অ্যান্ড রান' হচ্ছে আমাদের মূলনীতি। তোকে দিয়ে হিটও হবে না, রানও হবে না; যুদ্ধ করবি কী করে?

রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সৈন্যেরা সোনাভানকে বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গেলে এক বছরের শিশুপুত্র রতনকে বুকের মধ্যে নিয়ে পশ্চিমের ঝোপজঙ্গল পাড়ি দিয়ে বাদল পরামানিক বহু কষ্টে ভারতে পৌঁছায়। সে একা নয়, তার সঙ্গে ছিল আরও অনেক লোকজন। এর আগেও আরেক দফা মিলিটারির হামলা হয় গ্রামে। সেবারও প্রাণভয়ে সবাই দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় জঙ্গলের ভেতর। পরদিন পিসকমিটির নেতা এবাদত মোল্লা অভয় দিলে প্রায় সবাই ফিরে আসে গ্রামে। চার-পাঁচজন যুবক ফেরে না। মেহেন্দির বিল পেরিয়ে চলে যায় ভারতে। বাদল পরামানিক সেই রাতে বর্ডার পেরিয়ে সীমান্তঘেঁষা কয়েকটি গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে এপারের চেনাজানা বেশ কিছু লোকজনের সাক্ষাৎ পেলে আশ্বস্ত বোধ করে বটে, কিন্তু দুধের শিশু রতনকে নিয়ে কী করবে সে ভেবে পায় না। অবিরাম কেঁদেই চলেছে রতন। তার এই ক্রন্দন প্রতি মুহূর্তেই সোনাভানের অনুপস্থিতি এবং অপরিহার্যতার কথা মনে করিয়ে দেয়। দুধসর গ্রামে সোনাভানের দূর সম্পর্কের রহিমা খালার দেখা পেলে সে হাত বাড়িয়ে রতনকে কোলে তুলে নেয় কিন্তু ভয়ানক মুখ ঝামটা দেয় বাদলকে,

– সোনাভানকে তালি মেলেটারির হাতে তুলে দিলি বাবা?

এমন ধারার অভিযোগ শুনে অনাহারক্লিষ্ট তাড়া খাওয়া বাদল পরামানিকের মাথায় চক্কর দিয়ে ওঠে। দুচোখ অন্ধকার হয়ে আসে। মুখে কিছুই বলতে পারে না। সে রাতে যমদূতের মতো সহসা আর্মির ট্রাক এসে দাঁড়ায় তাদের পাড়ায়, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে নামে যমদূতেরা, অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বাড়িতে বাড়িতে, রাজাকারেরা ঘরবাড়িতে আগুন লাগাতে লাগাতে এগিয়ে আসে। বাড়ির সামনে বাদলকে পেয়ে তার কাঁধে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে দুজন রাজাকার। আর তখনই ফর্সা ধবধবে একজন খানসেনা সোনাভানের চুলের মুঠি চেপে ধরে, তার কোলের শিশু রতনকে হেঁচকা টানে উঠোনে ফেলে দেয়। শিশুকণ্ঠের ভয়ার্ত কান্নায় আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে। সারা শরীর দুমড়ে-মুচড়ে সোনাভান জানোয়ারদের থাবা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, রতনের দিকে হাত বাড়ায়; কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাঁজাকোলে জাপটে ধরে ওদের ট্রাকে তুলে নিয়ে যায় তাকে। ঘরে ঘরে তখন তাণ্ডব চলছে রাজাকারদের। বেপরোয়া লুটপাট আর অগ্নিসংযোগের মুখে টিকতে না পেরে গ্রামের মানুষ রাতের অন্ধকারেই ঝোপজঙ্গলের

মধ্যে দিয়ে পাড়ি জমায় নিরুদ্দেশের পথে। রতনকে বুকে জড়িয়ে বাদলও তাদের সঙ্গে পথে নেমে পড়ে। দুর্বিষহ সেই রাতের এত কেচ্ছা রহিমা খালাকে আর শোনাতে ইচ্ছে করে না। নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথাও বলতে ইচ্ছে করে না। সে রহিমা খালার হাত ধরে অনুনয় করে– রতনকে তুমি দেখো খালা। তারপর ঘোষণা করে, আমি মুক্তিফৌজ হব, যুদ্ধে যাব।

না, মুক্তিফৌজে তাকে নেওয়া হয়নি। দুই পায়ের অসমতার জন্যে তাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় যে! শত্রুর ওপরে আঘাত করেই গেরিলা যোদ্ধাকে দৌড়ুতে হয়, খানাখন্দ-ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে প্রাণপণে দৌড়ুতে হয়। খোঁড়া পায়ে বাদল পরামানিক দৌড়ুবে কেমন করে! সে যতই বলুক দৌড়ুতে পারবে, শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে দৌড়ুতে দৌড়ুতেই তো বর্ডার টপকে ভারতে এসেছে, কাঁধে রাইফেল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্যেও দৌড়ুতে পারবে; তার কথায় কেউ কান দেয় না। অবশেষে মুনতাজ কমান্ডার মজার এক প্রস্তাব দিয়ে বসে,

– তুই যেটা পারিস, সেই কাজটাই আমাদের এই ক্যাম্পে এসে শুরু কর বাদল।

বাদল মুখ তুলে তাকায়, কী যেন ভরসা জাগে তার চোখে। তখন তার কাজের কথা পরিষ্কার হয়।

কমান্ডার বলে,

– তুই মুক্তিযোদ্ধাদের চুল-দাড়ি কামিয়ে দিবি। তোর অস্ত্রপাতির ঝোলা কই?

অস্ত্রপাতি মানে নাপিতের ক্ষুর-কাঁচি-চিরুনি। হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে পালানোর সময় এই সব অস্ত্রপাতির কথা কারো মনে থাকে! কোনো উত্তর না দিয়ে বাদল পরামানিক ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকে। সে বেশ বুঝতে পারে, স্বর্গে গেলেও ঢেঁকিকে ধান ভানতেই হয়। এ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। তাকেও সেই নাপিতের কাজই করতে হবে। মুনতাজ কমান্ডার তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, এটাই তোর মুক্তিযুদ্ধের কাজ, বুঝেছিস?

সহসা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় বাদল পরামানিক। তারপর অস্ত্রপাতি কিনে দিলে সে তার কাজে লেগে যায়। কিন্তু অচিরেই সে টের পায়– দেশে বিজয় না আসা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই চুল-দাড়ি কাটবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। তখন কী করে বাদল! খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর ঝাঁকড়া চুলে আচ্ছাদিত মুক্তিযোদ্ধাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলকে। তাদের চোখেমুখে দৃপ্ত শপথ এবং সাহসের ঝলকানি দেখে মুগ্ধ হয়। একদিন সে ল্যাংড়া-খোঁড়া ভিখারির ছদ্মবেশে গুপ্তচরের দায়িত্ব পালনের আগ্রহ প্রকাশ করে। পরীক্ষামূলকভাবে দু'এক দফা সে দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালনও করে। দেশের ভেতরে গিয়ে রেকি করে এসে নিখুঁত সংবাদ এনে দেয়। মুনতাজ কমান্ডার তার পিঠ চাপড়ে বাহবা জানায়। তবু তার মন ভরে না, আশা মেটে না। মাসখানেক পরে সে আরও দুঃসাহসী এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। স্বর্গে নয়, মর্তে গিয়েই সে ঢেঁকি হয়ে ধান ভানবে। ক্ষুর-কাঁচি-চিরুনি ঝোলায় পুরে সে চলে আসে নিজ এলাকায়। রাজাকার সর্দার এবাদত মোল্লার বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করে, নানাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। নাপিত হিসেবে তাকে দু'চার গ্রামের সবাই চেনে। যদি সে কারো কাজে লাগতে পারে! এবাদত মোল্লা যদি তাকে আর্মি ক্যাম্প কিংবা রাজাকার ক্যাম্পে ক্ষৌরকর্মের কাজটা পাইয়ে দেয়, সেই আশা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সোনাভানের কোনো সন্ধান যদি পায়, সেটাও এক স্বপ্ন। নিদেনপক্ষে একটা রাজাকারের গলার রগে যদি কোনোদিন ক্ষুর চালাতে পারে!

না, এসবের কিছুই সে করতে পারেনি। সারাদিন এপাড়া ওপাড়া ঘুরে ঘুরে দু'চারজনের চুল দাড়ি কামিয়ে দেয়, কারো বাড়ি এক মুঠো ভাত চেয়ে খায়। রাতের বেলা নিজের অগ্নিদগ্ধ বাড়িতেই একটা আধপোড়া চালার তলে শুয়ে থাকে। একটা বেওয়ারিশ কুকুর এসে তারই পাশে শুয়ে তাকে পাহারা দেয়। তবু স্বপ্নের ভেতরে হানা দেয় ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়ুনোর সেই ভয়াল দৃশ্য। স্বপ্নের এই দাপাদাপি তাকে অস্থির করে তোলে। বেশ কদিন পরে সে আবার পালিয়ে যায় ভারতে। রহিমা খালার কাছে গিয়ে রতনকে দেখে আসে। ওইটুকু ছেলে কী বুঝে বাপের দিকে হাত বাড়ায়। গালে টোল ফেলে হাসে। তখন বাদল পরামানিকের ভয় করে, সোনাভানের কথা মনে পড়ে। তখন খালার সামনে থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং দৌড়ে পালিয়ে যায়। কখনো মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে, কখনো শরণার্থী শিবিরে ক্ষৌরকর্ম করে দিন কাটায়। মুক্তিযোদ্ধাদের ফাই-ফরমাশ পেলে খুশি মনে পালন করে, প্রয়োজন হলে দেশের মধ্যেও যায় সংগোপনে; কিন্তু দৌড়ে পালানোর সেই দৃশ্য তাকে যখন-তখন তাড়া করে, আর তখনই ভয়ানক অস্বস্তি হয়। এই অস্বস্তির খচখচানি দীর্ঘকাল জুড়েই তার বুকে চেপে বসে আছে। অনেক সময় তা চাপা পড়েই থাকে, আবার মাঝেমধ্যে অনুকূল পরিবেশ পেলে তা বেরিয়ে পড়ে।

জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় এসে বাদল পরামানিকের খুব ইচ্ছে করে তার একমাত্র নাতি মানিককে একাত্তরের গল্প শোনানোর। এখন সে বড়ো হয়েছে, অনেক কথাই তাকে অবলীলায় বলা যায়। তার দাদির সম্ভ্রমহানির কথা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়ার কথা, বনজঙ্গল ভেঙে রাতের আঁধারে পালিয়ে যাবার কথা বলতে ইচ্ছে করে। বংশের ধারা বদলে দেবার জন্যে রতন তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, কলেজ-পড়ুয়া মানিক দেশ-দুনিয়ার কত খবর রাখে, সে কেন নিজের জন্মের ইতিহাস জানবে না? আপন দাদির সম্ভ্রম হারানোর কথা জানবে না? এ দেশের কত মানুষের কত ত্যাগ আছে স্বাধীনতার জন্যে, সে কথা না জানলে বড়ো হবে কী করে!

কিন্তু না, মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা এসব নিয়ে মোটেই আগ্রহ নেই মানিকের। বর্তমান স্বাধীনতা নাকি স্বাধীনতাই নয়। বাদল পরামানিক চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে থাকে, তার নাতি দৃঢ়তার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়– বেশি দেরি নেই, নতুন স্বাধীনতা আসছে; তুমিও দেখতে পাবা, হ্যাঁ।

নতুন স্বাধীনতার আর কী দেখবে অশীতিপর বৃদ্ধ বাদল পরামানিক! বিগত তিপ্পান্ন বছরে তো কম কিছু দেখেনি! এ গ্রামে স্কুল ছিল না, স্কুল হয়েছে, বিদ্যুতের আলো এসেছে, কাঁচা রাস্তা চকচকে পাকা রাস্তা হয়েছে। সেই রাস্তার মাথায় নতুন মাদ্রাসাও খোলা হয়েছে। গ্রাম্য নাপিতের নাতি স্কুল পেরিয়ে কলেজে যাচ্ছে, এসব কি কম কিছু! মানিকের সামনে এসব বলতে গেলেই ফল হয়ে যায় উল্টো। এ কারণে সে প্রচলিত পথ থেকে সরে আসে, একদিন রাতের অন্ধকারে মানিকের দাদির প্রসঙ্গ তোলে,

– দাদির কথা তোর মনে পড়ে মানিক?

ঝটপট উত্তর দেয়,

– হ্যাঁ, মনে পড়ে তো!

উত্তরটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ শোনায়। বাদল পরামানিকের বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস আছড়ে পড়ে। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মানিক শুধায়,

– দাদিকে তুমি স্বপ্নে দেখেছ নাকি?

– আমি তো রোজই দেখি, তুই কখনো দেখিস? তোর সঙ্গে তার কত ভাব ছিল মনে পড়ে না?

মানিক অতি শৈশবেই হারিয়েছে দাদিকে। খুব গা-ন্যাওটা ছিল। মাকে চেনার চেয়ে সে দাদিকেই বেশি চিনেছিল। পুত্র জন্মের পর মানিকের মা দীর্ঘ সময় অসুখে ভোগে। তখন নাতির দায়িত্ব স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে কাঁধে তুলে নেয় সোনাভান। পেটের ছেলে রতনকে যতটুকু আদর-যত্ন সে করেছে, রতনের ছেলে মানিককে তার চেয়ে কম কিছু করেনি। এমনিতেই প্রবল স্নেহপ্রবণ মাতৃঅন্তকরণের মানুষ ছিল সোনাভান। বিজয়ের পর আর্মি ক্যাম্প

থেকে মুক্ত হয়ে আবারও স্বামী-পুত্র-সংসার ফিরে পাবে তা ভাবতেই পারেনি। আবারও বেঁচে থাকা! আবারও সংসার যাপন! তখন চারপাশে কত না কদর্য কথাবার্তা! সেসবের কিছুই কানে তোলেনি বাদল পরামানিক, বুকে টেনে নিয়েছে লাঞ্ছিতা স্ত্রীকে। রহিমা খালা এসে শিশু রতনকে কোলে তুলে দিয়েছে। বেঁচে থাকার এই অবলম্বন বুকে নিয়ে আবারও স্বপ্ন দেখেছে। অনেকদিন পরে এক সময় আবারও একটি সন্তানের প্রত্যাশা জেগেছে তার, স্বামীকে জানিয়েছে– ছেলে হোক মেয়ে হোক অন্তত আরও একটি সন্তান তার চাই। কিন্তু প্রকৃতি মুখ ফিরিয়েছে নির্মমভাবে। সন্তান ধারণের সক্ষমতা সে একাত্তরেই হারিয়েছে। দীর্ঘ বিলম্বে হলেও রতনের ছেলে মানিক এসে তার অপূর্ণ তৃষ্ণা খানিকটা নিবারিত করে। মানিক বেড়ে ওঠে তারই আদর-যত্নে। বছর চারেকের ব্যবধানে মানিকের বোন মায়া এলেও দাদির পূর্ণ মনোযোগ কাড়তে পারেনি। সোনাভানের তখন শরীর খারাপ। বছর খানেক রোগভোগের পর একদিন টুপ করে জীবনের ওপারে চলে যায়। কিন্তু এসব সাতকাহনের বিন্দুবিসর্গও কি মনে আছে মানিকের?

স্ত্রী বিয়োগের পর ভয়ানক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে বাদল পরামানিক। রাতের বেলা পুরানো সেই অভ্যাস তাকে আঁকড়ে ধরে। চোখ বুজলেই মনে হয় কে বা কারা যেন ভীষণ তাড়া করেছে। সে প্রাণভয়ে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে মেহেন্দি বিলের দিকে। একাত্তরের সেই সঙ্গী-সাথী কেউ নেই, সে একাই দৌড়ুচ্ছে। জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু দৌড়ুচ্ছে। তার একমাত্র পুত্র রতনই বা কোথায়? তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলে বাগ্‌যন্ত্র স্ফুট হয়, সে আকুল কণ্ঠে ডেকে ওঠে,

– রতন! ও রতন! স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে রতন তখন পাশের ঘরে ঘুমিয়ে। জন্মদাতা বাপের কণ্ঠের আর্তি সেখানে পৌঁছে না।

দাদুর ঘরে মানিকের অধিষ্ঠান হয় আরও কয়েক বছর পরে। সে তখন গ্রামের স্কুলে পড়ে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে পরের ক্লাসে ওঠে। একা একাই পড়াশোনা করে, বইপত্র গুছিয়ে স্কুলে যায়। বাড়ি এসে স্কুলের গল্প করে দাদুর কাছে। মুগ্ধ হয়ে শোনে দাদু, অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে নাতির মুখের দিকে, যেনবা রূপকথার রাজপুত্তুর দ্যাখে। স্কুলজীবনের শেষ প্রান্তে একদিন সেই রাজপুত্তুর মুখভার করে বাড়ি ফিরে জানায়, কেউ নাকি তাকে নাপিতের ছেলে বলে ঠাট্টা করেছে। তাই সে আর স্কুলে যাবে না।

বাদল পরামানিক হা হা করে উচ্চস্বরে হেঁসে বলে– ঠিকই তো বলেছে তারা। তোর বাপ-দাদা সবাই পরামানিক, আমার বাপও ছিল পরামানিক। তুই কিন্তু শুধুই মানিক। পরামানিক বাদ। তোর কি রাগ করলে চলে!

সেই মানিক কলেজে যাবার পর সহসা যেন বড়ো সেয়ানা হয়ে যায়। দেশের কথা, রাজনীতির কথা নিয়ে দাদুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করে। আজকাল আর নাতির কথার উত্তর দিতেও ইচ্ছে করে না, মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে। নাতি তবু তড়পায়। কী করেছ একাত্তরে? মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেটও নিতে পারোনি একটা!

বাদল পরামানিকের মুখ হা হয়ে যায়। কী বলবে সেই কথা খুঁজে পায় না। বিস্ময়ে চোখ গোল করে তাকিয়ে থাকে। বছর দুয়েকের মধ্যে তার নাতিটা কেমন অচেনা হয়ে গেল, হিসেব মেলাতে পারে না। কোনো কোনো দিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরাই হয় না তার। এ নিয়ে কিছু বলাও যাবে না তাকে। এই তো সেদিন রাতে নাতিকে কাছে পেয়ে সে জিজ্ঞেস করে,

– মেহেন্দির বিল চিনিস মানিক?

প্রশ্ন শুনে মানিক অবাক হয়, সেই বিল কি আর বিল আছে? এখন ফসলের মাঠ। একটু থেমে জানতে চায়, হঠাৎ এ মেহেন্দির বিলের কী হলো?

– না, তেমন কিছু না। বাড়ির পশ্চিমের সেই বনবাদাড় ঝোপজঙ্গলও নেই। এক বুক পানির সেই মেহেন্দির বিলও নেই। পাল্টে গেল কত কিছুই।

মেহেন্দির বিলের ওপারেই তো ইন্ডিয়া। আবার যাবা নাকি ইন্ডিয়ায়?

– না না। ও দেশে আমার কে আছে?

– তাহলে ঘুমাও। ঝোপজঙ্গল ভেঙে পালানোর স্বপ্নটা যদি আবার আসে, আমাকে ডাক দিও। এখন ঘুমাও।

মাত্র দুদিন পরেই বাদল পরামানিকের সেই ভয়াবহ স্বপ্নটা এভাবে ফিরে আসবে, কে জানত সেই কথা! ঢাকায় ছাত্রদের খুব আন্দোলন হচ্ছে, গোলাগুলি চলছে, এ রকম খবর তার কানেও এসেছে। বাড়ির বাইরে যেতে পারে না, আসল খবর পাবে কোথায়! ভাসা ভাসা খবর পায়। কীসের এই গোলমাল, কেন এই গোলাগুলি– সেসবের বিশেষ কিছুই জানে না। বাজার থেকে বাড়ি ফিরে রতন একবার বলেছিলেন, দেশের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। 'ভালো মনে হচ্ছে না' মানে কী, কতটা খারাপ পরিস্থিতি, তার কিছুই অনুমান করতে পারেনি বাদল পরামানিক। দুদিন পরেই আনন্দে-উত্তেজনায় লম্ফঝম্প করতে করতে বাড়ি ফিরে মানিক ঘোষণা করে– পাখি ফুড়ুৎ।

দাদুর কাছে এসে দুহাত নাড়িয়ে সে জানায়, পাখি উড়ে গেছে ইন্ডিয়ায়। তার চোখে-মুখে সে কী উল্লাস আর উচ্ছ্বাস! যেনবা সে নিজে হাতেই দূর নীলিমায় উড়িয়ে দিয়েছে নীড়হারা পাখি। দাদুর মুখের কাছে আঙ্গুল নাচিয়ে কেমন অবলীলায় সে জানিয়ে দেয়– আজ থেকে দেশ আবার স্বাধীন হলো। এ হলো নতুন স্বাধীনতা।

নাতির মুখের উচ্ছ্বসিত প্রগলভতা শুনতে শুনতে বাদল পরামানিকের প্রবল জোরে হিক্কা ওঠে। থামতে চায় না বরং অতি দ্রুত তা বাড়তেই থাকে। বউমা এসে পানির গ্লাস বাড়িয়ে ধরে। পরপর কয়েক গ্লাস পানি খেলে হিক্কা কিছুটা উপশম হয়। বউমা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। গায়ের ওপর পাতলা চাদর টেনে দেয়। ধীরে ধীরে হিক্কার জোর মিইয়ে আসে। তখন তার দুচোখের পাতা মুদে আসে। তবু চোখের গভীরে উদ্ভাসিত হয় একাত্তরের সেই পলায়ন দৃশ্য। কারা যেন তেড়ে আসছে, মারমুখো উল্লাসে ছুটে আসছে, আর কণ্টকিত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সে প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে নিরুদ্দেশে।

এ দৌড়ের বুঝি সীমা নেই, শেষ নেই।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা

এস আর সবিতা

১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মন্তুদ দিন। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বিজয়ের উষালগ্নে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৪ মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন –পিআইডি

হারানোর দুঃসহ বেদনার দিন। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের শেষলগ্নে পুরো দেশের মানুষ যখন চূড়ান্ত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে, ঠিক তখনই পাকবাহিনী এবং দেশীয় নরঘাতক রাজাকার, আলবদর ও আলশামসরা মেতে ওঠে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞে। বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে বাঙালিকে মেধাশূন্য করার এ নৃশংস নিধনযজ্ঞ সেদিন গোটা জাতিসহ পুরো বিশ্বকেই হতবিহ্বল করে দিয়েছিল। বিজয়ের আনন্দে যখন বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত, তখন এই আনন্দে একটা বিষাদের ছায়ায় শোকে মুহ্যমান হলো বিজয়ী জনতা, যখন শুনল, তাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। ইতিহাসের পৈশাচিক এ হত্যাকাণ্ড বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নামে খ্যাত। প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়।

বাঙালি জাতির দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামে এই বুদ্ধিজীবীরা মেধা, মনন ও লেখার মাধ্যমে স্বাধীনতার সংগঠকদের প্রেরণা জুগিয়েছেন। দেখিয়েছেন মুক্তির পথ। গোটা জাতিকে উদ্দীপ্ত করেছেন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম যেন কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের। কেননা, বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমের মাধ্যমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়ে পাঠদানে, চিকিৎসা, প্রকৌশল, রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে। একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী শূন্য করে দেওয়া। ২৫শে মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিতে, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ থেকে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ৪ তারিখ হতে ঢাকায় নতুন করে কারফিউ জারি করা হয়। ১৪ই ডিসেম্বরকে বুদ্ধিজীবীদের নিধনযজ্ঞের দিন হিসেবে স্মরণ করা হলেও ১০ই ডিসেম্বর ইতিহাসের এ ঘৃণ্যতম অপকর্ম জোরদার করে। সপ্তাহজুড়ে এদের তালিকায় একে একে উঠে আসে বুদ্ধিদীপ্ত সাহসী মানুষের নাম।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাত্র দুদিন আগে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে ঘাতক চক্র কেবল ঢাকা শহরেই প্রায় দেড়শো বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশার কৃতী মানুষকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায় অজ্ঞাত স্থানে। রাতের আঁধারে তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের বাসা থেকে চোখ বেঁধে রায়েরবাজার ও মিরপুর বধ্যভূমিতে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী, প্রকৌশলী, লেখকসহ চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসরেরা জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান বধ্যভূমি ছিল আলেকদি, কালাপানি, রাইনখোলা, মিরপুর বাংলা কলেজের পশ্চাদভাগ, হরিরামপুর গোরস্থান, মিরপুরের শিয়ালবাড়ি, রায়েরবাজার প্রভৃতি স্থান। রায়েরবাজার ও মিরপুরের জলাভূমিতে ডোবানালা, নিচু জমি ও ইটখোলার মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের বহুসংখ্যক মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা এবং পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত এই লাশগুলোর অধিকাংশেরই দেহ ফুলে উঠেছিল। তাঁদের বুকে মাথায় ও পিঠে ছিল বুলেটের আঘাত এবং সারাদেহে বেয়নেটের ক্ষতচিহ্ন। স্বাধীনতার উষালগ্নে উন্মুখ মানুষ স্বজন হারানোর সেই কালরাত্রির কথা জানতে পেরে শিউরে উঠেছিল। স্থবির হয়ে গিয়েছিল সবকিছু।

হত্যার পূর্বে যে তাঁদেরকে নির্যাতন করা হয়েছিল, সে তথ্যও বের হয়ে আসে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে প্রকাশিত *বুদ্ধিজীবী দিবসের সংকলন*, পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সাময়িকী *নিউজ উইকের* সাংবাদিক নিকোলাস টমালিনের রচিত নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে শহিদ হন সহস্রাধিক বুদ্ধিজীবী।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডা. আবদুল আলীম চৌধুরী, অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, ডা. ফজলে রাব্বী, সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লা কায়সার, ড. জি সি দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক রশীদুল হাসান, ড. আবুল খায়ের, ড. মুর্তজা, সাংবাদিক খন্দকার আবু তাহের, নিজামউদ্দিন আহমেদ, এস এ মান্নান (লাডু ভাই), এ এন এম গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ নাজমুল হক, সেলিনা পারভীনসহ অনেকে।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ঢাকার মিরপুরে প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। ঢাকার রায়েরবাজারে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নামে আরেকটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ শুরু হয়, যা ১৯৯৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়। এটি রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ ও শহিদ বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ নামেও পরিচিত। স্মৃতি স্মারকটির অবস্থান ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রায়েরবাজার এলাকায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সহযোগীদের সহায়তায় দেশের যে-সকল শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্যদের হত্যা করেছিল, তাঁদের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এটি নির্মাণ করা হয়।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীতে স্থপতি ফরিদউদ্দীন আহমেদ এবং স্থপতি জামি-আল-শফি-র নকশায় ১৯৯৬ সালে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে ১৯৯৯ সালে শেষ হয়। রায়েরবাজার বধ্যভূমির আয়তন ৩.৫১ একর। স্মৃতিসৌধের প্রধান অংশে রয়েছে ১৭.৬৮ মিটার উচ্চতা, ০.৯১ মিটার প্রস্থ এবং ১১৫.৮২ মিটার দৈর্ঘ্যের ইটের তৈরি দুই প্রান্ত ভাঙা এবং বাঁকানো একটি দেওয়াল। যা ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহ প্রাপ্তির ইটখোলাকে নির্দেশ করে। আর দেওয়ালের ভগ্ন দুইপ্রান্ত বুদ্ধিজীবী হত্যার দুঃখ এবং শোকের গভীরতা নির্দেশ করছে। দেওয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বর্গাকৃতির জানালা রয়েছে। জানালা দিয়ে পেছনের আকাশ দেখা যায়। আর এই জানালাটি দেওয়ালের শোকের গভীরতা কমিয়ে আশার বাণী বয়ে আনে। বাঁকা দেওয়ালের সামনে রয়েছে একটি স্থির জলাধার, যেখানে পানির নীচ থেকে কালো গ্র্যানাইট পাথরের একটি স্তম্ভ ওপরে উঠে এসেছে। যা মুহ্যমান শোকের প্রতীক।

প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর শোকের আবহে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়। দেশের সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। ওড়ে শোকের প্রতীক কালো পতাকা। দেশব্যাপী বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠন শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, আলোচনাসভা, গান, আবৃত্তি, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, স্বেচ্ছায় রক্তদান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপ্রধান এবং এরপর সরকারপ্রধান মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে শহিদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যরা এবং যুদ্ধাহত ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা সকালে মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এবং রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর সর্বস্তরের মানুষ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে। সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করে বিশেষ নিবন্ধ। জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সব মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা করা হয়।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বাণী দিয়েছেন। পৃথক বাণীতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন তাঁরা।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর বাণীতে বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করতে বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। তিনি শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির যে-কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ঠিক আগমুহূর্তে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের এই দিনে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ দিনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বেদনাবিধুর দিবস। তাদের আত্মত্যাগের প্রেরণায় বাঙালি জাতি আজও সংগ্রামী, সাহসী এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে। এ দিনে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অবদান স্মরণ করি এবং তাঁদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

এস আর সবিতা: কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

কোটি প্রাণের ঐকতানে

হাসান হাফিজ

আগুনে বারুদে ঝাঁজে বিস্ফোরণে
অনন্য ভাস্বর হয়ে আছ তুমি
মৃত্তিকা ও সবুজে-শ্যামলে-শস্যে
উদার নিঃসীম নভোনীলে
সর্বত্রই স্বাগত নন্দিত শুদ্ধ
তোমার উত্থান অস্তিত্ব তোমার
সাড়ে সাত কোটি প্রাণ একাত্তরে
ঐকতানে বেজে উঠেছিল
বিজয়ের মহতী ঝংকারে
আত্মশক্তি উদ্বোধনে
অর্জিত হয়েছে শেষে মাটি ও মায়ের মুক্তি
অগণন তাজা প্রাণ বিসর্জনে
সম্ভ্রমের বিনিময়ে
আমরা পেয়েছি শুদ্ধ রক্তেভেজা দেশ
কখনো কিছুতে এই
অর্জনের লয় নেই
অহংয়ের ক্ষয় বলতে কিছু নেই
আছে শুধু জাগরণ, আছে শুধু প্রত্যয়ের উদ্‌যাপন।

শতাব্দী অগণন

আবু জাফর আবদুল্লাহ্

'৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর
বাঙালি জাতির এক গৌরবময় ইতিহাস।
চিরস্থায়ী এক অর্জন লাল-সবুজ পতাকা।
যে জাতির নিজস্ব পতাকা নেই,
বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে সে জাতির আপনার বলে কিছু নেই।
ন' মাস প্রভূত রক্তক্ষরণ আর
লাখো লাখো মানুষের আত্মত্যাগে
করেছি আপনার চে' আপন বসতি স্থাপন।
স্বাধীন-সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রের বিকাশ-অর্জন।
বিজয়ের সে গৌরব ছিনিয়ে এনেছি আমরা
বর্বর পাক-হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে,
শর্তহীন আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আমাদের কাছে।
বিশ্ব দরবারে আমরা আজ স্বাধীন বাঙালি জাতি
বাংলাদেশ নামের একটি দেশের অধিবাসী।
সম্মানিত, শ্রদ্ধাশীল, স্বাধীন
বাঙালি জাতির গৌরবগাথা ইতিহাস অমলিন।

স্রষ্টা যেনো লাল-সবুজ পতাকাসহ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে
অক্ষুণ্ন রাখেন শতাব্দী অগণন।

তোমাকেই ভালোবাসি হে স্বাধীনতা

জাকির আবু জাফর

তোমাকে ভালোবাসি হে স্বাধীনতা
তোমাকেই ভালোবাসি
তোমাকে আরাধ্য করি আমার সমগ্রতায়।

আমার স্বপ্ন জাগরণ, আমার প্রতিদিনের আয়োজনে
প্রতিটি পদক্ষেপে, তুমিই আমার সাহস।
তুমি মর্যাদার ভাষা হয়ে, বহমান নদী হয়ে,
ঢেউয়ের প্রাচুর্য হয়ে ছুটে যাও আমার বুকে।
সহসা তুমি আমার বঙ্গোপসাগর।
আমার অতলান্ত জলধির বিশালতা!

আমি তোমাকে বিছিয়ে হয়ে উঠি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল।
দিগন্ত দিশারি ফসলের মাঠ, ঝিম সবুজের সান্নিধ্য
আমি সটান দাঁড়িয়ে যাই, দুলতে থাকি মৌসুমি বাতাসে।
দুলতে দুলতে দেখি ফসলের বিস্তীর্ণ মাঠও আমার স্বাধীনতার নিশান।

দক্ষিণা হাওয়া হাসে, আমাকে বুলিয়ে যায়
আমি তোমার পরম উষ্ণতায় সুখী মুখে হেসে উঠি।
আমি হাসলেই হেসে ওঠে বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা তুমি থেকো আমার সঙ্গে
আমার কর্মে, আমার কল্পনায়,
আমার সর্বাঙ্গীণ বাংলাদেশে।

আমার বাতাসে ছড়িয়ে দাও অবমুক্তির ঘ্রাণ
তুমি তো জানো একটি নদী কীভাবে নদী হয়!
একটি নারী কীভাবে নারী হয়! এবং
একটি দেশ কীভাবে দেশ হয়ে ওঠে!

তুমিই আমার পতাকার সম্মান
আমার মর্যাদার পতাকা
পৃথিবীর মানচিত্রে তুমিই লিখেছো
আমার দেশের নাম।

আমার মাটির গন্ধে ধুয়ে নেবো তোমাকে
বাজিয়ে নেবো পাতার মর্মরে
সকালে দোয়েলের কণ্ঠে বেজে ওঠো
হে আমার স্বাধীনতা।
তোমার আনন্দেই আমার পতাকায় জন্মালো একটি লাল সুরুজ!

হে স্বাধীনতা তুমি চিরদিন বুকে রাখো
আমার সবুজ বাংলাদেশ!

দহনে পোড়া বিজয় দিবস

অর্ণব আশিক

বিজয় দিবস এলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়
বুকের আশ্রয় থেকে যন্ত্রণারা অশ্রু হয়ে নামে
কি এক নিঃস্বতা প্রতিটি ক্ষণে টুপটাপ ঝরে।

বিজয় দিবস এলেই মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ঘুমন্ত স্মৃতিগুলো
আততায়ী হয়ে আমাকে কাঁদায়,
অসংখ্য লাশ, নির্যাতিত মা-বোনের চাঁদপানা মুখ
বিধ্বংস ঘরবাড়ি- রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট, পোড়া জমি,
মরীচিকা হয়ে ফুঁপিয়ে নড়ে ওঠে মনের বাঁধানো ফ্রেমে।

বিজয় দিবস এলেই আনন্দের সাথে
স্বজন হারানো যন্ত্রণারা নেমে আসে নদীর স্রোতের মতো
বিজয় দিবস এলেই বুকের ভেতর দহন বাড়ে
দেশমাতৃকার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী মুক্তিযোদ্ধা,
ইজ্জত হারানো লাঞ্ছিত মা-বোনের মুখগুলো
একরাশ কান্না আগুন হয়ে হৃদয়ের কার্নিশে পোড়ায়।

অন্য জীবন

চন্দনকৃষ্ণ পাল

তখন রাত শুধু নয়, দিনগুলিও থমথমে
মাঝে মাঝেই বোমারু বিমানের ছুটোছুটি
এখানে ওখানে ভয়াবহ শব্দ আর তারপরই
আকাশ পানে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী
লকলকে আগুনের জিহ্বাতে সব পুড়ে ছাই...
পিঁপড়ের মতো মানুষের জীবন
এখানে ওখানে লাশের সারি আর
চিল-শকুনের হুল্লোড়ে কুকুররাও কোণঠাসা!

কোন এক গভীর রাতে মাঠ, পাহাড়, জঙ্গল পার হয়ে
কমলপুর দুর্গা মন্দিরের মাঠে
হাজারো শরণার্থীর ভিড়ে শুরু হয় অন্য জীবন–
রেশনের লাইন, তিন ইটের চুলোয় রান্না
পিতার চোখে ধু ধু বালুচর ...

ধর্মনগর-কালাছড়া-পদ্মবিল-উপ্তাখালীর
ক্যাম্প ঘরে নমাসের জীবন–
এক অন্য জীবনের ঘোর ভেঙে ফিরে আসা নিজের ভিটেয়...
ভিটে কই? ঘর পোড়া ছাইও আজ মিশে গেছে ধূসর মাটিতে!

বিজয় দিবস

আ. শ. ম. বাবর আলী

স্বাধীনতার বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বরে
যুদ্ধ শেষে মুক্তিসেনা আসলো ফিরে ঘরে।
স্বাধীনতার জন্য দিলো ত্রিশ লক্ষ প্রাণ,
আমাদের এই স্বাধীনতা তাদের অবদান।
শহিদ-গাজীর অবদানে এলো স্বাধীনতা,
বিজয় দিনে পড়ছে মনে তাদের সবার কথা।
বোন হারালো ভাইকে কত মা হারালো ছেলে,
তাদের মহান আত্মত্যাগের তুলনা কি মেলে?
নয়টি মাসে কী যে কঠোর কঠিন সাধনাতে,
যুদ্ধ তারা করেছিল অস্ত্র নিয়ে হাতে।
ছিল না তো জীবনের ভয় আহার নিদ্রা কিছু,
বনবাদাড়ে ঘুরছে তারা খানসেনাদের পিছু।
খানসেনাদের গোলার মুখেও ছিল না ভয়মাত্র,
কাটিয়েছে দুঃসহ জীবন সারাটা দিন রাত্র।
এমনিভাবে যুদ্ধ করে নয়টি মাসের শেষে,
আনলো তারা স্বাধীনতা সোনার বাংলাদেশে।
সেই দিনটি একাত্তরের ডিসেম্বরের ষোলো,
ইতিহাসে 'বিজয় দিবস' নামটি লেখা হলো।

বিজয় এলো ডিসেম্বরে

দেলওয়ার বিন রশিদ

একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ
পাক হানাদার এসে
ঝাঁপিয়ে পড়ে হঠাৎ করে
সোনার বাংলাদেশে।

লাগায় আগুন পোড়ায় শহর
পোড়ায় গ্রাম আর বাড়ি ঘর
মারে মানুষ, লাশের সারি
নদীতে যায় ভেসে।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
শপথ নিল খেলা ফেলে
অস্ত্র নিল হাতে তুলে
যুদ্ধে গেল আঁধার ঠেলে।

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পরে
বিজয় এলো ডিসেম্বরে
মায়ের মুখে ফুটলো হাসি
কালো রাতের শেষে।

স্বদেশের মাটির ছোঁয়া

সুজন বড়ুয়া

আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা ২০১১। ৩৫তম বারের মতো বসেছে এ মেলা। মাঝখানের সাত বছর বিরতি দিয়ে আমরা এবার আবার যোগ দিয়েছি মেলায়। আমরা বাংলাদেশের একটি সরকারি প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধি। বাংলাদেশ থেকে সরকারি-বেসরকারি মোট পনেরোটির মতো সংস্থা এ মেলায় যোগ দেয়। একটি বড়ো প্যাভেলিয়নের ভেতরে প্রতিটি সংস্থার জন্য খোপ খোপ করে করা হয় পৃথক স্টল। আবার বাইরের দিকে পুরো প্যাভেলিয়নটার নাম দেওয়া হয় বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন। মেলা খোলা থাকে দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। আমাদের সংস্থা থেকে এসেছি আমরা দুজন কর্মকর্তা। আমার সঙ্গে আছেন সহকর্মী মোহাম্মদ ফরহাদ। আমাদের সাহায্যকারী হিসেবে আছেন স্থানীয় একজন তরুণ কর্মী। তার নাম প্রকাশ রায়।

বাংলাদেশের বই-পুস্তক সম্পর্কে ভারতবর্ষের মানুষের প্রবল আগ্রহ। খোলার পর থেকেই প্রায় সারাদিন স্টলে লোকজনের আনাগোনা লেগে থাকে। বই দেখেন, কেনেন। প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নানাকিছু জানতে চান। বিচিত্র কৌতূহল মানুষের।

এখন বেলা দুটো। আমরা তিনজনই স্টলে আছি। ক্রেতাসেবা দিচ্ছি হাসিমুখে। বিকালের ভিড়ের চাপ এখনো পুরোদমে শুরু হয়নি। দু'একজন ক্রেতা আসছে-যাচ্ছে। এরই মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন ক্রাচে ভর দিয়ে। আমি খেয়াল করে দেখি ভদ্রলোকের ডান পায়ের হাঁটু থেকে নীচের অংশ নেই, ডান হাতের বগলে একটি ক্রাচ ধরা। বাঁ পা স্বাভাবিক, ডান পায়ের শূন্যতা তিনি পূরণ করেন ক্রাচ দিয়ে। পরনে সাদা ধুতি ও হাফ ফতুয়া, তার ওপর ঘিয়ে রঙের কটি। ভদ্রলোক গভীর মনযোগে বই দেখছেন। তার সঙ্গে আছে পনেরো-ষোলো বছরের এক কিশোর। তার হাতে একটি বইয়ের ব্যাগ।

ভদ্রলোক ডিসপ্লে টেবিল থেকে বেছে বেছে দুটি বই হাতে নিলেন। একটি মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি ভাষা আন্দোলনের পরিচিতিমূলক বই। প্রকাশের হাতে বই দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকান। মুখে মিষ্টি হাসি। বললেন, দাদা, কী নাম আপনার?

আমি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করি, আমার নাম প্রণবেশ সেন।

ওহ, তাই নাকি? আমার নাম নিরঞ্জনচন্দ্র সেন। তো আপনার বাড়ি নিশ্চয় বাংলাদেশে, বাংলাদেশের কোথায়? ভদ্রলোকের চোখেমুখে ঔৎসুক্য।

আমি সরাসরি উত্তর দেই, চট্টগ্রাম জেলায়, রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে।

চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া! নিরঞ্জনচন্দ্র সেন নামের ভদ্রলোকটি যেন বিস্ময়াভিভূত।

– কী বলেন দাদা!

– কেন, কোনো সমস্যা? আমি অবাক হয়ে নিরঞ্জনবাবুর দিকে তাকাই।

– না, কোনো সমস্যা নয়, বরং সমস্যার সমাধান হলো।

– তার মানে? আমি আরও ব্যগ্র হয়ে উঠি।

– বলছি, অবশ্য সে অনেক কথা। প্রথমত জানাই যে, আজ আমার দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হলো। কাছের একজন মানুষের খোঁজে আমি প্রায় প্রতিবছর এক দুবার কলকাতা পুস্তক মেলায় এসেছি। এত বছর পর আজ মনে হয় তার খোঁজ পেয়ে গেছি।

– দাদা, কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। কেমন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। একটু খুলে বলবেন কি? আমি গভীর কৌতূহলে তাকিয়ে থাকি।

নিরঞ্জনবাবুর চোখেমুখে যেন এক বেদনামাখা প্রশান্তি।

– সে বড়ো লম্বা কথা দাদা, তবে বেশ চমকপ্রদ। এর কিছু হয়ত আপনাদের জানা। তবু খানিকটা আপনাকে শোনাতেই হবে। তার আগে আমি একটু ভেতরে ঢুকে বসি?

– হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আমি নিরঞ্জনবাবুকে স্টলের ভেতরে স্বাগত জানাই। একটি খালি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে দিই তাকে। কিন্তু আমি আগ্রহ চেপে রাখতে পারছিলাম না।

– বলুন।

নিরঞ্জনবাবু বুক শেলফের পাশে তার ক্রাচটা দাঁড় করিয়ে রেখে চেয়ারে বসেন।

– বলছি, শুনুন।

দুই

আমি এক সর্বহারা মানুষ দাদা। আমার নিজের বলতে কিছু নেই। এখানে আমি আছি ঠাকুরদার বাড়িতে। ঠাকুরদা ছিলেন ইতিহাসখ্যাত মানুষ, মাস্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মী ও সহযোদ্ধা। দুজনের বাড়িও ছিল একই গ্রামে– চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়ায়। ঠাকুরদার নাম সুরেশচন্দ্র সেন। সূর্য সেনের মতো আমার ঠাকুরদাদাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পাস করেন। তারা দুজনই ছিলেন চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানবাজার এলাকার উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

আন্দোলনে সংগ্রামে বিক্ষোভে সুরেশচন্দ্র ছিলেন সূর্য সেনের ছায়াসঙ্গী। ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ বছরই তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রামে চারটি বড়ো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে জেলা যুব সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩০ সালের শুরুতে সূর্য সেন চট্টগ্রামে একটি সুসংগঠিত বিপ্লব গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এ বছর ১৮ই এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে মোট ৬০ জন বিপ্লবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে পাহাড়তলী ফৌজি অস্ত্রাগার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ভবন এবং পুলিশের অস্ত্রাগার দখল করে নেন। এই সঙ্গে সামরিক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে চট্টগ্রামকে স্বাধীন ঘোষণা করা হয়। এই সশস্ত্র বিদ্রোহের চার দিন পর ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এরপর যুদ্ধ হয় আরও কয়েকবার। প্রতিবারই ইংরেজ বাহিনী পিছু হটে। সূর্য সেন আত্মগোপনে থেকে বিপ্লবী তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে সন্ধানদাতার জন্য ইংরেজ সরকার নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার ঘোষণা করে।

১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি এক নিকট-আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় চট্টগ্রামের পটিয়ার গৈরলা গ্রাম থেকে সূর্য সেন গ্রেপ্তার হন। সুরেশচন্দ্র সেন সূর্য সেনের সঙ্গে সব বিপ্লবী তৎপরতায় অংশ নিলেও এ দিন তিনি ছিলেন অন্যত্র। তাই তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে আত্মগোপনে থাকতে থাকতে কয়েকদিন পরই তিনি কলকাতায় চলে যান। তারপর ঘুরে দেখতে থাকেন কলকাতার আশপাশের জেলা-শহরগুলো। এভাবে এসে পড়েন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাতে। বারাসাতের একটি ছোটো স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ক্রমে তিনি থিতু হয়ে বসেন বারাসাত সদরে। চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামে তখন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পরিপূর্ণ সংসার। পৈতৃক জমি-জমাও আছে অল্পবিস্তর। পুত্র নরেশচন্দ্র মাধ্যমিক আর কন্যা স্বপ্নারানী প্রাথমিক পর্যায়ের পড়ুয়া। গ্রামে যাতায়াত করতে না পারলেও সুরেশচন্দ্র নানা তরফে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নিয়মিত।

পুত্র নরেশচন্দ্র মেট্রিক পাস করে শহরের চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হলে সুরেশচন্দ্র স্ত্রী বিনোদবালা আর কন্যা স্বপ্নাকে স্থায়ীভাবে নিয়ে যান বারাসাতে নিজের কাছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষে স্বপ্নাকে বিয়ে দেন বারাসাতেই। আর পুত্র নরেশচন্দ্র বিএ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন চট্টগ্রামে। তখন ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত পাকিস্তান দুটি আলাদা দেশ হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন চলছে। নরেশচন্দ্রের শরীরে বিপ্লবী সুরেশচন্দ্রের রক্ত প্রবহমান। বিএ ফাইনাল ইয়ারের টগবগে তরুণ ছাত্র। তিনি কি ন্যায়সংগত এ আন্দোলনে চুপ থাকতে পারেন? ভাষা আন্দোলনের পক্ষে মিছিলে-স্লোগানে প্রকম্পিত করে তুলছেন কলেজ প্রাঙ্গণ রাজপথ। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যতিক্রমী এই আন্দোলনের বছরেই নরেশচন্দ্রের সংসারে আমার জন্ম।

আন্দোলন করতে করতেই নরেশচন্দ্রের ছাত্রজীবনের ইতি ঘটল। সরকারের দমনপীড়ন, শোষণ-নির্যাতনে হতোদ্যম হয়ে পড়লেন তিনি। বিএ পাস করে কোনো চাকরির দিকে গেলেন না আর। শুরু করলেন স্বাধীন ব্যবসা– কাগজের ব্যবসা।

আমার মা নিরুপমা দেবী নোয়াপাড়া গ্রামে থাকতেন। আমি গ্রামেই বেড়ে উঠি। এরই মধ্যে আমার একটি বোন হয়। গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করে আমি শহরে বাবার কাছে চলে আসি। শহরে এসে আমি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হই। তখন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চলছে। আন্দোলন বিক্ষোভের মধ্যে আমি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তখন ১৯৭১ সাল। সে-বছরই শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক নিরীহ বাঙালি হত্যা, নির্বিচারে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালাও-পোড়াও চলছে। অগত্যা আমরা শরণার্থী হয়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে আসি ভারতে। তবে

আমরা শরণার্থী শিবিরে না থেকে বারাসাতে ঠাকুরদাদার বাসায় এসে উঠি।

আমার রক্তে তখন প্রলয় নাচন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র আমি। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে না গিয়ে বাসায় শুয়ে-বসে থাকব? বিপ্লবী সুরেশচন্দ্রের নাতি আমি। বিবেকের দংশনে দংশিত হতে থাকি একান্তে। যুদ্ধে যাওয়ার ছক কষতে থাকি মনে মনে। শেষে একদিন কাউকে না জানিয়ে যোগ দিই প্রশিক্ষণ শিবিরে– আগরতলা সীমান্তের কাছে মেলাঘরে। তখন ১৯৭১ সালের মে মাস। এক মাসের যুদ্ধ প্রশিক্ষণ শেষে শুরু হয় যুদ্ধ অভিযান। আমাকে যুক্ত করা হয়েছে একটি বিশেষ গেরিলা গ্রুপের সঙ্গে, যার কাজ ভারতসীমান্ত এলাকার নিকটবর্তী পাকিস্তান সেনা ক্যাম্পে আচমকা হামলা করা। কয়েকবার সফল চোরাগোপ্তা হামলা অভিযান হয়ে গেল আমাদের।

এবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা সীমান্তরেখায় সালদা নদী আক্রমণ। এই সালদা নদী মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ পথ। সালদা নদী ঘেঁষে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্থায়ী কোনো ঘাঁটি ছিল না। নদীর পূর্ব পাড়ে মন্দভাগ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। পশ্চিম পাড় দখলে না থাকলেও তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কাছাকাছি চাঁদলা গ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে ছিল পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। মাঝেমধ্যে তারা সেখান থেকে সালদা নদীর পাড়ে এসে অস্থায়ীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের নজরদারিতে রাখে, আবার চলে যায়। যাতে পাকিস্তানি সেনারা এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান না করে সেজন্য মুক্তিযোদ্ধারা সুযোগ বুঝে তাদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালায়।

অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতে দেখা গেল পাকিস্তান বাহিনীর একটি বড়ো দল সালদা নদীর পশ্চিম পাড়ে বাংকার খনন করছে। এই অবস্থা দেখে আমাদের গেরিলা গ্রুপ পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্দেশ পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ২৩শে অক্টোবর রাতে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তিন দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের পরিকল্পনা করে। একটি দল সালদা নদী রেলস্টেশনের পূর্ব দিকে পাহাড়ি এলাকায়, একটি দল নদী অতিক্রম করে সালদা নদী ও গুদামঘরের পশ্চিমে এবং অপর দলটি পাকিস্তানি সেনাদের পেছনে অবস্থান নেয়। সেদিন এই তিনটি দলের একটির সঙ্গে যুক্ত ছিল আমাদের গেরিলা গ্রুপ। আমি ছিলাম সালদা নদী রেলস্টেশনের পূর্ব দিকে পাহাড়ি এলাকায় অবস্থানকারী দলে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাঁড়াশি আক্রমণে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেদিন। পাকিস্তানিদের গুলিতে শহিদ হন নদী অতিক্রমকারী দলের সদস্য হাবিলদার আদুল লতিফ। আর আমি হারাই আমার ডান পা। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানিদের ছোঁড়া মর্টার শেল এসে লাগে আমার পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান পা উড়ে যায়। সহযোদ্ধারা আমাকে সোনামুড়া ক্যাম্প হাসপাতালে এনে চিকিৎসা-শুশ্রূষা দেন। পরে আমার পরিবার সেখান থেকে এনে উন্নত চিকিৎসা দিলেও পা আর জোড়া লাগানো যায়নি। তারপর থেকে আমার নতুন জীবনের সূচনা, এখন ক্রাচই আমার ভরসা।

তিন

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম নিরঞ্জনবাবুর কথা– সমৃদ্ধ এক জীবনের গল্প। আমার সামনে চেয়ারে বসে আছেন তিনি। সায়াহ্নবেলার ক্লান্ত অবসন্ন চেহারা, যেন জীবনযুদ্ধে এক পরাজিত সৈনিক।

তবে আমি একই সঙ্গে বিস্মিত ও উদ্দীপিত। কত ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্য এই নিরঞ্জনবাবু। উপমহাদেশের রাজনীতির কয়েকটি গৌরবময় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাঁর পূর্বপুরুষ। নিজের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিঃস্বার্থ অবদান রেখেছেন তিনি। অথচ নিয়তি, রাজনীতি ও যুদ্ধ কীভাবে বদলে দিয়েছে তাঁর জীবন! কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি বলি, স্বাধীনের পর নতুন দেশে আর ফিরে গেলেন না দাদা?

এবার যেন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিরঞ্জনবাবু, না, আর ফেরা হলো না। যুদ্ধে গুরুতর আহত হওয়ার ফলে আমার চিকিৎসার পেছনে সময় লেগে গেল কয়েক বছর। এরই মধ্যে বাংলাদেশে কত পটপরিবর্তন! পরিবার আমাকে পাঠাতে রাজি হলো না আর। এখানে ঘর-সংসার হলো, ছোটো বোনটিরও বিয়ে দেওয়া হলো এখানে। এখানে সবই আছে। তবু ভালো নেই আমি।

আমি অপলক তাকিয়ে আছি নিঞ্জনবাবুর দিকে। স্মৃতিকাতর করুণ চোখ দুটো যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে তার। খানিক থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, আমার শৈশবের মায়াময় গ্রাম, সেই টলোমলো পদ্মদিঘি, ঝুরিনামা বটেরঘন ছায়া বিছানো সেই মেঠোপথ, ঢেউদোলা অবারিত সবুজ ধানক্ষেত, পাহাড় ঘেরা নদী-সমুদ্র আমাকে যেন কেবল হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি প্রতি রাতে স্বপ্নে দেখি শহিদমিনার, সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ আর আমার সোনার বাংলাকে।

এবার আমি নিরঞ্জনবাবুর নাতির দিকে তাকাই, দাদুকে একবার বাংলাদেশ ঘুরিয়ে আনো। দাদুর ভালো লাগবে।

নিরঞ্জনবাবুর নাতি লাজুক হাসে।

– সে আর এ জীবনে হবে কিনা জানি না। এখন আপনার কাছে আমার একটি মিনতি, আপনি আমার জন্মগ্রামের মানুষ, আপনার হাত দুটো একটু দিন আমি ছুঁয়ে দেখি, তাহলে আমি স্বদেশের মাটির ছোঁয়া পাবো।

নিরঞ্জনবাবুর অবয়বে আকুল কাতরতা।

আমি সসংকোচে বাড়িয়ে দিই আমার করপুট। নিরঞ্জনবাবু দুহাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন নিবিড় করে। আমার হাত ছুঁয়ে তিনি কী পেলেন আমি জানি না, তবে তাঁর হাত ছুঁয়ে আমি যেন ঐতিহ্যের উষ্ণ স্পর্শ পেলাম।

———— ○ ————

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ৯ই ডিসেম্বর ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বেগম রোকেয়া দিবস এবং বেগম রোকেয়া পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৪' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন— পিআইডি

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া

শারমিন ইসলাম

অবরোধের অন্তঃপুরে প্রশ্নহীন আনুগত্যের জীবন তাঁরও যাপন করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তা না করে জেগে উঠেছিলেন, রুখে দাঁড়িয়েছেন। স্বপ্ন দেখেছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন নিজে বাঁচবেন, বাঁচাবেন নারীসমাজকে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তাঁর সঙ্গে তাঁর সমকালের বা আজ এ শতাধিক বছর পরের পৃথিবীর আর কারো সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না। হতে পারে না। তাঁর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আবেগ-উদ্যম ও শক্তি সাহসের মূল্য পরিমাপ করার সাধ্য আমাদের অনেকেরই নেই। অনেক উচ্চ শিক্ষিতেরও নেই। আপন আলোয় উদ্ভাসিত এ নারী আজীবন আলোর জগতে বিচরণ করেছেন, আলোর সাধনা করেছেন, প্রাণে প্রাণে আলো জ্বেলেছেন। বলছিলাম নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার কথা।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জহির উদ্দিন আবু আলী হায়দার সাবের এবং মাতা রাহাতুন্নেসা চৌধুরী। তাঁর প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন এবং বৈবাহিক সূত্রের নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বলা যায়, বেগম রোকেয়ার জন্মলগ্নে মুসলমান সমাজ ছিল নানাবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত। তাই রোকেয়ার পিতা নিজে বহু ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন একেবারে রক্ষণশীল। পরিবারের পর্দা প্রথা এতটাই প্রবল ছিল যে, আত্মীয় পুরুষ তো দূরের কথা বহিরাগত নারীদের সামনেও মেয়েদের পর্দা নিতে হতো। নারী শিক্ষার সুযোগ বলতে শুধু কোরান শিক্ষা ও উর্দু শিক্ষাই প্রচলিত ছিল। বাংলা শেখা ছিল নিষিদ্ধ। তাই স্কুল-কলেজের আঙ্গিনায় পা বাড়ানোর সৌভাগ্য বেগম রোকেয়ার হয়নি। তবে রোকেয়ার বড়ো ভাই ইব্রাহিম সাবের আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন। তাই রোকেয়ার অদম্য উৎসাহ দেখে তিনি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে রোকেয়া ও তাঁর বড়ো বোন করিমুন্নেসাকে গোপনে বাংলা ও ইংরেজি শেখাতেন। ১৮৯৬ সালে ১৬ বছর বয়সে ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্বামী মুক্তমনা ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। তিনি রোকেয়াকে জ্ঞানার্জনে আগ্রহ ও প্রেরণা দেন। তাঁরই উৎসাহে বেগম রোকেয়া বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং ধীরে ধীরে সাহিত্য চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯০২ সালে প্রথম 'পিপাসা' নামে তাঁর এক রচনা প্রকাশিত হয় *নবপ্রভা* পত্রিকায়। এ রচনার মধ্য

দিয়ে তিনি সাহিত্যজগতে পুরোপুরি পদার্পণ করেন। রোকেয়া তাঁর নারীবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন *মতিচূর* প্রবন্ধ সমগ্রের প্রথম (১৯০৪) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯২২)। *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯০৫), পদ্মরাগ (১৯২৪), অবরোধবাসিনী (১৯৩১) ইত্যাদি তাঁর সৃজনশীল রচনা। তাঁর *সুলতানার স্বপ্নকে* বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে একটি মাইলফলক ধরা হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে তাঁর লেখাগুলো *নবনূর*, *সওগাত*, *মোহাম্মদী* ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর লিঙ্গসমতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। হাস্যরস আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাহায্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসম অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনা দিয়ে তিনি সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, ধর্মের নামে নারীর প্রতি অবিচার রোধ করতে চেয়েছেন, শিক্ষা আর পছন্দানুযায়ী পেশা নির্বাচনের সুযোগ ছাড়া যে নারী মুক্তি আসবে না– তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। নারী শিক্ষা ছাড়া নারী মুক্তি হতে পারে না, আর নারী মুক্তি ছাড়া কখনও একটি সভ্য সমাজ গড়ে উঠতে পারে না, এ নিগূঢ় সত্যটা তিনি হৃদয় দিয়ে কঠিন বাস্তবতার আলোকে অনুধাবন করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৯ সালে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী জোগাড় করেন এবং স্বামীর প্রদত্ত অর্থে মাত্র ৫ জন ছাত্রী নিয়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতার ১৩ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে তিনি নবপর্যায়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালের মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা একশত পেরিয়ে যায়। স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রোকেয়া নিজেকে সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রেখেছেন। ১৯১৬ সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

অন্যদিকে বেগম রোকেয়া লেখনীকে আরও বেগবান করে তোলার মাধ্যমে সামাজিক চিত্র তুলে ধরেন। পুরুষ শাসিত এ সমাজে নানারকম নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, কুসংস্কার, অবিচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, পর্দার নামে অবরুদ্ধ জীবনযাপনে বাধ্য করা এসব বাস্তব কাহিনি ক্রমাগত তাকে আহত করে তোলে। তাই এ অবস্থা থেকে নারীসমাজকে পরিত্রাণের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এই ব্যাকুলতাই তাকে দুর্বার করে তোলে, তার চলার পথে নানারকম বাধা, সমালোচনা তাকে ঘিরে ফেলে, কিন্তু রোকেয়া থেমে থাকেননি। এখানেই রোকেয়ার সফলতা, বরং তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সমালোচনার জবাবও দিয়েছেন। রোকেয়ার সংগ্রাম ছিল মূলত দুই ধরনের। একদিকে ঘুমন্ত নারীসমাজকে জাগিয়ে তোলা, যা তাঁর 'সুবহে সাদেক' প্রবন্ধে প্রকাশ ঘটে। অন্যদিকে, সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। তাঁর এ সংগ্রাম কখনও পুরুষের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তনই ছিল তাঁর কাম্য। দাসী নয়, সহধর্মিণীরূপে, সহযোদ্ধারূপে পাশে রাখাই ছিল তাঁর আহ্বান। তাই তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্য তাহাই'। 'সুবহে সাদেক' প্রবন্ধে তিনি নারীদের উদ্দেশে লিখেছেন–'বল আমরা পশু নই, বল ভগিনী আমরা আসবাব নই, বল কনে আমরা জড়োয়া অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকবার বস্তু নই, সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ!'

রোকেয়া এ উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম নারীবাদী আন্দোলনের একজন প্রবক্তা ছিলেন– একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তিনি আমাদের গর্ব। বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মাত্র ৫২ বছর বয়সে বেগম রোকেয়া মারা যান। বিশ্বমানের বিচারে আজও বেগম রোকেয়া চর্চার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বেগম রোকেয়া শুধু নারীর অধিকার ও জাগতিক মুক্তির কথাই বলেননি; প্রায় এক শতাব্দী আগে সাম্প্রদায়িকতাহীন মুক্ত জীবনবোধ ও জীবনাচরণে উৎসাহ দিয়েছিলেন। রোকেয়ার সমাজ চিন্তা ও সমাজ পরিবর্তনের বিশ্বাস আধুনিক মতবাদে উজ্জীবিত। নারীর কাঙ্ক্ষিত মুক্তিসাধন ও নারী শিক্ষায় উদ্দীপ্তপ্রাণ বেগম রোকেয়া তাই চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবেন তাঁর আপন কীর্তি ও সৎকর্মের জন্য।

শারমিন ইসলাম: প্রাবন্ধিক

চরের চালাঘরে

মাশ্‌হুদা মাধবী

অবশেষে পৌঁছানো গেল তবে, চরের মাটিতে পা রেখে ভাবল চমন আরা। অচেনা ছোট্ট চরটিতে ব্যক্তিগত অত্যন্ত জরুরি কারণে আসতে হবে কখনো ঘুণাক্ষরে কি ভেবেছিল?

মাত্র কদিন আগে ভোরে টিভি নিউজ প্রতিবেদনে চরবাসী একজনকে দেখে চমন চমকে উঠেছিল। অতীত জীবনের প্রিয় মানুষটির সঙ্গে চরবাসীর চেহারায় অদ্ভুত মিল। বাম কপালে ডানদিকে অবিকল সে-ই বড়ো কালো দাগটিও! নামও এক! কীভাবে সম্ভব। তবে কী ...?

মনে নানান প্রশ্ন নিয়ে চমন আরা প্রাত্যহিক কাজ, দায়িত্ব সবই পালন করলেও মাঝেমধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। চপলের তারস্বরে হাঁক-ডাকে ঘোরাচ্ছন্নতা কাটিয়ে বাস্তবে ফিরেছে। ... আম্মু, আম্মু, নাস্তা দাও। সাতসকালে মায়ের ম্লান মুখে চিন্তার আঁকিবুঁকি দেখে চপল উদ্বিগ্ন, 'আম্মু, কিছু সমস্যা হয়েছে?' কিন্তু তখন ভেঙেচুরে বিস্তারিত চমনের জানানো বা চপলেরও শোনা হয় না। স্কুল এবং কলেজে যাওয়ার সময় তখন দুজনেরই।

ইদানীং মায়ের সঙ্গে সংসারের সব সমস্যা, জীবনের সুখদুঃখ ভাগাভাগি করে নিতে চায় চপল। ব্যতিক্রম হলেই তার মুখ মলিন, মন খারাপ। ছেলে এখন বড়ো হয়েছে। তবু মা তাকে যাবতীয় সমস্যা থেকে দূরে শান্তি-স্বস্তিতে রাখতে চায়। পক্ষান্তরে নিজে সব সময় স্বস্তিতে থাকতে পারে না সংগত কারণে। মায়ের বাধ্য সুবোধ ছেলে চপলকে নিয়েও কখনো বাড়তি চিন্তা কিন্তু করতে হয়। কিছু দিন আগেই এমন এক সময় এলো। ঘটনাচক্রে

চমনের ঘনিষ্ঠজন চাকরিজীবী বকুল স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের অনেক বছর পরে বয়সে অনেক বেশিই ছোটো বাউন্ডুলে এক ছেলেকে বিয়ে করে ফেলে। নিঃসঙ্গ একজনের নিতান্তই ব্যক্তিগত জীবনের এই ব্যাপারটা যেন টক-ঝাল-মিষ্টি আচার, এপিটাইজারের মতো মুখরোচক হয়ে গেল। মফস্বল শহরে তুমুল সমালোচনা, আলোচনার ঝড়, টক অব দ্য সিটি। বকুলের কথা মুখে মুখে।

স্বাভাবিকভাবে চপলও কলেজে বন্ধুদের কাছে জেনেছে। জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা মা, আন্টির এই কাজটা ভালো না খারাপ হলো? অনেকে কী কী বলছে ওনার নামে।' কিশোর ছেলেকে ব্যাপারটা বোঝানো কঠিন। চমন স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে বলে– 'একজনের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কেন মাথাব্যথা আব্বু? কখনো এমন ব্যতিক্রমী ব্যাপার হয়, হতে পারে জগৎ সংসারে।' তারপরও কয়েক দিন চপলকে চিন্তাচ্ছন্ন দেখে চমন বোঝে ছেলের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে ঘটনাটা। চপল বড়ো হচ্ছে তাইতো মায়ের একাকিত্ব কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারে, কষ্ট পায় মায়ের জন্য। মাকে নিয়ে ইদানীং যা মনে মনে ভাবছে তা জানাতে যথেষ্ট দ্বিধা হলেও কিছুদিন পরে নিরুপায় কিশোর বলেই ফেলে, 'আম্মু একটা কথা।' ছেলের ইতস্তত ভাব দেখে চমন হেসে আশ্বাস দেয়, 'বল, ব্যাটা বল'।

কথাটা হলো, ছেলে সুপাত্রে মায়ের বিয়ে দেবে! চমন হাসি লুকিয়ে গম্ভীর মুখে বলে, 'হুমম! তা আমার মুরুব্বি আব্বা হুজুর, কনের পাত্র পছন্দ হয় কিনা, বিয়েতে কনে রাজি আছে কিনা জানতে হবে তো? তা সুপাত্রটি কে, কী করেন বাপজান? ছেলে ঝটপট উত্তর দিলো! তিনি চপলের কলেজ শিক্ষক। ভদ্রলোক চমনেরও পরিচিত। চার/পাঁচ বছর আগে ওনার স্ত্রী কোভিডে মারা যাওয়ার দুঃসংবাদে যথেষ্ট মন খারাপ হয়েছিল চমনের। অনাকাঙ্ক্ষিত চরম সেই দুর্যোগকালে আতঙ্কে ম্রিয়মাণ চমন অনুভব করত, দুঃসময়ে কাছে প্রয়োজন আপনার জন! কিন্তু তাদের কেউ নেই ত্রিভুবনে! মহামারির কিছু দিন আগে অল্প সময়ের ব্যবধানে বাবা-মা দুজনেই মারা যান।

'আম্মু হ্যাঁ বলবে কিন্তু'। মাকে চুপচাপ চিন্তিত দেখে এ যুগের বিবেচক স্মার্ট ছেলের চটপট আবেদন। ইতোমধ্যে নিজের মতের পক্ষে চপল একাধিক যুক্তিও দিয়েছে। 'আম্মু, ইন্টারমিডিয়েট হলেই আমাকে বাইরে পড়তে পাঠাবে। ঠিক কিনা? বাড়িতে একা থাকবে কীভাবে? ছেলের চিন্তা হবে না?' চমনের উপলব্ধি হলো বড়ো হবার সমান্তরালে চপলের স্বভাব হয়েছে বিজ্ঞ বিবেচকদের মতো। আরও বড়ো হলে ছেলের নিজস্ব জগৎ বিস্তৃত হবে, চমনের একাকিত্বও বাড়বে, এটা কঠিন বাস্তব সত্য। তবে চমন ভীত নয়। বরং অভ্যস্ত প্রবহমান এই নিঃসঙ্গ জীবনে। এরও পরে বার্ধক্যে ছেলের বৌয়ের সংসারে কতটা সমাদরে মমতার নিরাপদ আশ্রয় হবে কে জানে? চমন সিনিয়র সহকর্মী অনেকের জীবনের তিক্ত কষ্টকর অভিজ্ঞতা জানে! ওনারা অনেক বার পরামর্শ দিয়েছেন যেন সে বিয়ে করে।

এর মধ্যেই নিউজ প্রতিবেদনটি দেখা। চরবাসীটির সঙ্গে চেহারায় অদ্ভুত সাদৃশ্য চপলের বাবার। অনেকটাই বাবার মতো দেখতে তার ছেলেটিও। কিন্তু দুর্ভাগ্য, জন্মের আগে নিখোঁজ বাবা সম্পর্কে চপল অল্পই জানে, প্রকৃতপক্ষে চমনের নিজেরও তাই। রমিজের একটি মাত্র পাসপোর্ট সাইজের ঝাপসা হয়ে আসা ছবি আছে যা দেখে চেহারা বোঝা কঠিন। আফসোস হলেও এই অন্যরকম জীবনেই দীর্ঘদিনের অভ্যস্ততা।

চমনের স্বল্প শিক্ষিত কিন্তু যথেষ্ট সচেতন বাবা একমাত্র সন্তানকে কাছে রাখার আকাঙ্ক্ষায় এবং মানবিক কারণেও পরিচিত একজনের বাসায় আশ্রিত এতিম ছেলেটির সঙ্গে কিশোরী মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। নিজের ছোট্ট সংসারে জামাইকে ছেলের মতো রাখলেও একদিন গৃহত্যাগী হয় জামাইটি। প্রায় আঠারো বছর আগের কথা। তখন হাতে হাতে মোবাইল ফোনের যুগ নয়। স্থানীয় থানায় জিডিসহ নানাভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কোনো খবর মেলেনি। বহু বছর চমনের বিশ্বাস ছিল নিখোঁজ রমিজ জীবিত আছে। খারাপ খবর দ্রুতগামী, বাতাসের আগে ছোটে। মন্দ খবর যেহেতু মেলেনি তা-ই ধোঁয়াশাই থেকে যায়। যেন কুহেলি কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেছে জলজ্যান্ত মানুষটা!

রমিজউদ্দিন চলে যাওয়ার পর কয়েক বছর হয়ে গেছে তখন। বিধি মতো চমনকে তার বাবা-মা আবার বিয়ের জন্য চাপ দিলে ইতোমধ্যে বিএ পিটিআই পাস সরকারি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক চমন ঘোরতর আপত্তি জানায়। দাম্পত্য সঙ্গীহীন জীবনে একাকিত্বের যন্ত্রণা থাকলেও সন্তান চপলকে নিয়ে যথেষ্ট আনন্দও ছিল। কোনোভাবেই চপলের বিন্দুমাত্র মানসিক কষ্ট বা চাপ হোক চায়নি সে।

তার কাছে রমিজের হাহাকার নিয়ে লেখা চিরকুটটি রয়ে গেছে, 'প্রিয় চমন আরা, শেকড়ের সন্ধানে চললাম। মা-বাবার ঠিকানা, ভিটেমাটি খুঁজে পাই বা না পাই তোমার কাছেই ফিরবো। গোপনে চলে যাবার অপরাধ মাফ করো।' সেদিন ভোরে ঘুম ভাঙলে চমন চমকে উঠেছিল। কারণ মাত্র নয় মাস একান্ত আপন করে কাছে পাওয়া সহজসরল আবেগী তরুণ মানুষটি পাশে নেই। আছে তার লেখা চিরকুটটি। কিশোরীর ব্যাকুল প্রত্যাশা রমিজ ফিরে আসবে। যদিও দীর্ঘ প্রতীক্ষা বৃথা হয়েছে।

চলে যাবার আগে চমন কিছুদিন থেকে প্রায় চিন্তাক্লিষ্ট, অন্যমনস্ক দেখাতো রমিজকে। বাড়িতে সহজ স্বাভাবিক থাকলেও কখনো বলত, বাবা-মায়ের সঙ্গে চমনের সুন্দর সম্পর্ক দেখে ইদানীং নিজের বাবা-মাকে খুবই মনে পড়ে। মনে আশা তাদের খোঁজে বের হবে যাদের স্নেহসাহচর্য পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি! এর মধ্যে

শ্বশুর, স্ত্রীর উৎসাহে দ্বিতীয় বার এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। রমিজের মর্মবেদনা জেনে বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের বড়ো মানুষটিকে স্কুলছাত্রী চমন অল্প বয়সের অনভিজ্ঞতায় সেভাবে প্রবোধ সান্ত্বনা দিতে বা বুঝতে পারেনি অন্যপক্ষের শূন্যতা, মানসিক যন্ত্রণা। তবে রমিজ নিখোঁজ হবার পরপর নিজের ভেতরে ঠিকই বুঝেছিল চপলের অস্তিত্ব। ছেলের জন্ম হলে মহাযুদ্ধ শুরু নিজের সঙ্গে। কঠিন মনোবলে পড়াশোনা শেষে তার এই শিক্ষকতা পেশা। ব্যস্ততার পাশাপাশি ছেলেকে মনের মতো গড়ে তোলার সাধনা, পরম ব্রত চমনের। কত দুর্যোগ, প্রতিকূল সময়, ঝড়-ঝঞ্ঝা একা সামলাচ্ছে। পাশে কেউ নেই। মায়া, মমতা, গভীর স্নেহে মাথায় হাত রাখবে এমন আপনজন কোথায়?

এমনই একা জীবনে হঠাৎ এলো এই ক্রান্তিকাল। সেদিনই রাতে মায়ের কাছে বিস্তারিত শুনে চপলও স্বাভাবিক ভাবে উৎসুক-আগ্রহী, 'চলো তবে আম্মু! সেখানে তাড়াতাড়ি যাওয়া জরুরি।' এরপর চরটিতে যাবার তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত! হয়ত সে বাবাকেই দেখতে পাবে এমন প্রত্যাশায় অবর্ণনীয় খারাপ রাস্তা কখনো ঘোড়াগাড়িতে, কখনো কিছু পথ হেঁটে। এরপর ট্রলারে নদী পারাপার শেষে ঘাটে নেমে আবার ঘোড়াগাড়ি। সবশেষে বেশ কিছুটা পায়ে হেঁটে অনেক কষ্টে ক্লান্ত তারা পৌঁছালো কাঙ্ক্ষিত জনপদে।

তখন চৈত্রের তপ্ত দুপুর হঠাৎ ম্রিয়মাণ ছায়া ফেলেছে অচেনা চরের পথে মাঠে। চরের প্রান্তিক মানুষদের নির্দেশনায় অতঃপর তারা কাঙ্ক্ষিত সেই বাড়িটির আঙিনায়। উঠোনের এক কোনে বাঁশের খুঁটি ছনের ছাদ চারপাশ খোলা ছাপড়ায় দুপুরের রান্নায় ব্যস্ত সম্ভবত রমিজের স্ত্রী। আচমকা দুজন শহুরে আগন্তুক দেখে অবাক হয়। মুহূর্ত পরে পরিচয় জিজ্ঞেস করলে চমন অল্পকথায় উত্তর দিয়ে শেষে বলে, 'ছেলেটা বাপকে একনজর দেখবে শুধু'। তিনি বলেন, 'জ্বে দেকপেই তো বুজান। আপনের কতা মুই ওমরার কাছোত আগোত ম্যালা শুনছো। কিন্তু ছেলের কথা মোরা নাই শুনো, নাই জানো বাহে। তা চলি যাইবেন ক্যান ফির? গরিবের ঘরত নয়া সাগাই, মায়েছেলে দুইজনে এলা থাকি যান কয়ডা দিন।' একহাতে জলন্ত উনুনে শুকনো ডালপাতা, কলার ছতর ঠেলে অন্য হাতে পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমরা একনা ধরি বইসেন বাহে। মুই ভালো করিয়া হাঁটিতে না পাও, উঠিতে বসিতেও কষ্ট নাগে।' ভালোভাবে লক্ষ করে তার পায়ের ত্রুটি বুঝতে পারে চমন।

সৎ মায়ের অত্যাচার জর্জরিত দুধকুমার তীরের প্রতিবন্ধী কিশোরী মর্জিনার আহাজারি, কান্নায় নির্লোভ ভালো মানুষ রমিজ সেই সময়ে বাবা-মায়ের হদিস না পেয়ে হতাশ হৃদয়ে স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবার বদলে বিয়ে করে ফেলে দুঃখী অসহায় মেয়েটিকে। তাদের দুটি সন্তানও আছে। এই চরেরই বাসিন্দা।

বাবাকে দেখতে উদ্‌গ্রীব চপল শুনলো এক সময়ের ভ্যানচালক তার জন্মদাতা এখন অসুস্থ। আগের ঠিকানা তিস্তা গর্ভে বিলীন হবার পর ধরলার এই চরে তার নতুন বসতি পরিবার নিয়ে। রমিজের কর্মহীন দিন কাটে শুয়ে-বসে। অভাব-অনটন-দৈন্য ভরা জীবন।

মর্জিনার সঙ্গে জীর্ণ চালাঘরটির ভেতরে ঢুকে উৎসুক কিশোর চপল বিস্ময়বিমূঢ় হয়। প্রথম দেখা বাবার সঙ্গে তার চেহারায় বেশ মিল। বাবার অস্তিত্ব ছাড়া অভ্যস্ত হলেও মনের কোনো ঢের বেদনাও তো আছে। অন্যদের বাবাকে দেখে আফসোস হয় কখনো! তবে স্ত্রী-সন্তানকে দেখে একটু কুণ্ঠিতই হন রমিজ। দুজন শহুরে ফিটফাট মানুষের সঙ্গে নিজের এই সম্পর্ক অবিশ্বাস্য লাগে, যেন আকাশকুসুম চয়ন! ঐ শহুরে তরুণীটি তার স্ত্রী? এই সন্তান তার রক্তের! চপলের দুটি হাত ধরে কান্না জড়িত গলায় আঞ্চলিক ভাষায় রমিজ বলেন, এতো কষ্ট করিয়া তোমরা মোক দেকপার আসছেন হয় বাপজান? তিনি বাপজান ডাকলেও দ্বিধাগ্রস্ত চপল সহসা আব্বা, বাবা কোনো সম্বোধনই করতে পারে না। যদিও এ সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে সম্বোধনের বিকল্প নেই। চপলের দুর্ভাগ্য সবচেয়ে বড়ো এই রক্ত, মমতা সম্পর্ক সারাজীবন রইলো এমন যোগাযোগহীন, অধরা।

কাপড়চোপড়, প্যাকেটজাত খাবার, ফলমূল, কিছু টাকা চমন হাতে দিলে বিব্রত হলেও দরিদ্র রমিজ নেন। সেদিন সাক্ষাৎকার নিতে আসা সাংবাদিকরা বলেছিলেন টিভিতে আপনাকে দেখা যাবে। তখন থেকেই আশা এবার তার খোঁজখবর হয়ত জানতে পারে স্ত্রী চমন আরাও।

কিন্তু চমনদের ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। তার আগে খেতেও হলো পীড়াপীড়িতে। পাঁচমিশালি ছোটো মাছ দিয়ে উঠানের গাছের সজনেডাঁটার তরকারি, টলটলে পাতলা খেসারি ডাল, লেবু গরম ভাতের সঙ্গে অমৃত লাগে ক্ষুধার্ত চমনের। চপলের জন্য মর্জিনা ইঁদুরকানি আলু দিয়ে পাতিহাঁসের ডিমও রান্না করেছে। কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছে, 'হামার আন্না সালুন, ডিম আলুর ডাইল ছোলের কেমন বা নাগে বাহে!' এরপর গভীর আন্তরিকতায় চমনের ব্যাগে ভরেছে শুকনো টকমিষ্টি দেশি বরই, আঙিনার ঝোপের কাগজী লেবু।

সংকোচ কাটিয়ে বিদায়বেলায় চপল রমিজকে স্পর্শ করে বলতে পারে, 'আব্বু, আসি তবে!' রমিজ আবার হুহু কাঁদেন! চমন অবশ্য তখনও ছুঁতে পারেনি প্রিয় সঙ্গীকে। যাবতীয় আড়ষ্টতা কাটিয়ে রমিজউদ্দিনের মাথায় শেষ মুহূর্তে হাত রেখে চমনও বলতে পারে, 'আসি তাহলে চপলের আব্বা'! ক্রন্দনরত রমিজ বলেন, 'মোক মাফ করি দেও। আবার তুমি নতুন করিয়া সংসার করেন চপলের আম্মা।' তালাক, বিয়ের অনুমতি সবই দেন। চমন জানে দীর্ঘ বছর স্বামী নিখোঁজ, অনেক আগেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাই

অন্যত্র বিয়েও বৈধ। স্বাভাবিকভাবে বর্তমান চরবাসী এই রমিজের তা জানার কথা নয়। বিয়ে করুক বা না-ই করুক তবু দীর্ঘ বছর ধরে সংসারী রমিজের মৌখিক দেওয়া এই মুক্তিতে বেদনার বদলে বরং নিরেট স্বস্তিই পায় চমন।

বিদায়ের সময় উঠানভর্তি অগুনতি কৌতূহলী মানুষের ভিড়। এর মধ্যে চমনের পায়ে সালাম করল চরবাসী ভূমিহীন স্বামীদের নিয়ে রমিজের দুই মেয়ে। তাদের আন্তরিক অনুরোধ, 'বড়ো আম্মা গরিবের চালা ঘরত থাকি যান এক সাপ্তা।' সন্তানদেরও পরিচিত করায়, 'এডা বড়ো নানিআম্মা হয়, ও-ই অত্তি নালমনি শহরত থাকে, ফির ইস্কুলেতও পড়ায়। কদমবুসি করো এলা।' তাদের সেলফোন নেই বা চরে সেভাবে নেই নেটওয়ার্ক সংযোগও। তবু নিজের সেল ফোন নম্বর লিখে দেয় চমন।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ৯ই ডিসেম্বর ২০২৪ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বেগম রোকেয়া দিবস এবং বেগম রোকেয়া পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৪' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

মা-ছেলের সম্পূর্ণ অচেনা কুড়িগ্রামের এক ধুধু চরে বিষণ্ন বিকাল ম্লান হয়ে আসছে তখন। তাদের ফিরতে হবে। জীবনের অভূতপূর্ব অসাধারণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্পদ ধরে রাখতে স্মার্ট ফোনের গ্যালারি ভরে অসংখ্য ছবি তুলেছে চপল।

তবে সেইসঙ্গে ক্ষণিকের এই মায়ামোহ ছেড়ে নিজের ঠিকানায় এখন ফেরার জন্য যথেষ্ট উদ্‌গ্রীব মা-ছেলে। নদীর কাছাকাছি যেতে তাদের কিছুটা হাঁটতে হয়। ছোট্ট চরজুড়ে সবুজ শস্যক্ষেত, অল্প গাছবৃক্ষ, ইতস্তত ছড়ানো আটিয়া কলার ঝোপসহ অস্থায়ী জনপদ বুকে নিয়ে আঁকাবাঁকা নদী সূর্যের অস্তরাগে অপূর্ব রাঙা। নৌকায় নদী পার হবার পর ঘোড়াগাড়ি। গাড়িতে বসেই শ্রান্ত ক্লান্ত চপল পরম নির্ভরতায় মায়ের কাঁধে মাথা রাখে। আনমনে চমন বলে– 'বাবা, আজ অচেনা চরের নড়বড়ে এক চালাঘরে জীবনের অতি বড়ো এক পাওয়া হলো, তাই নারে? প্রথমবার বাবাকে দেখা হলো তোর'! চপলের গভীর দীর্ঘশ্বাস, 'হয়ত এ-ই শেষও আম্মু! পেয়েও না পাওয়াই। তাকে তো কখনো কাছে পাবো না। সেটা এখন আর সম্ভব নয়।' পাওয়া না পাওয়ার অভূতপূর্ব বিচিত্র এক অনুভব চপলের কিশোর মনজুড়ে। সন্ধ্যায় বিমূর্ত ছবির মতো ধূসর আবছা ম্লান বালুচরের নিভৃত নিরিবিলি জনপদ, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা গাছপালা, নড়বড়ে ছোটো ছোটো চালাঘর সব পেছনে ফেলে ঘোড়াগাড়ি তাদের নিয়ে তখন সামনে চলতে শুরু করেছে। এ যেন এক বিজয়। ঘোড়াগাড়ির তালের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মনোলোক চলছে তালে তালে। মানসলোকে কত স্মৃতি, প্রশ্ন, প্রস্তাব ও স্বপ্নও চলছে দ্রুতলয়ে। চলছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিজয়ের অভিযাত্রা।

———— ○ ————

৪ নারী পেলেন বেগম রোকেয়া পদক

সমাজ, নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের জন্য ৯ই ডিসেম্বর চারজন নারীকে বেগম রোকেয়া পদক-২০২৪ দেওয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই নারীদের বা তাঁদের প্রতিনিধিদের হাতে পদক তুলে দেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ১৪৪তম জন্ম ও ৯২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ নগরীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এ পদক বিতরণ করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

পদকজয়ীরা হলেন, শিক্ষাবিদ এবং অধিকার কর্মী, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের চেয়ারপারসন এবং কেন্দ্রীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পারভীন হাসান, শ্রমিক ও নারী অধিকারকর্মী এবং আলোকচিত্রী তাসলিমা আখতার, বাংলাদেশের প্রথম মহিলা আন্তর্জাতিক দাবা মাস্টার রাণী হামিদ এবং নারী অধিকার সংগঠন নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা শিরীন পারভিন হক। পুরস্কারপ্রাপ্ত নারীদের প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণপদক, একটি সার্টিফিকেট ও চার লাখ টাকার চেক দেওয়া হয়েছে।

বেগম রোকেয়া পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বেগম রোকেয়ার স্মৃতিকে ধারণ করে তাঁকে সম্মানিত করতে পেরে আমরা গর্বিত।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেন, ক্ষণজন্মা মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর কর্ম ও আদর্শের মাধ্যমে নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে যুগে যুগে অমর হয়ে আছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে বেগম রোকেয়া নারী জাতির মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করেন।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায়

স্বাধীনতা-স্বাদ পেয়েছি

আতিক রহমান

লাল-সবুজের পতাকা দেখলে
স্মৃতিতে অশ্রু ঝরে,
মলিন এ মুখে কী এক অসুখে
আব্বুকে মনে পড়ে।
গান ভুলে পাখি, ছেড়ে ডাকাডাকি
থাকে মন ভার করে,
এই বুক শুধু– হয়ে যায় ধু ধু
আব্বুকে মনে পড়ে।
সকালের ফুল অভিমান করে
বিকেলেই যায় ঝরে।
ফুলের ব্যথায় ব্যথিত চিত্তে
আব্বুকে মনে পড়ে।
নদীর গর্ভে জেগে ওঠে চর
প্রাণহীন নদী মরে,
সুখের বিয়োগে দুঃখ বেড়ে যায়
আব্বুকে মনে পড়ে।
এতিম শিশুরা চোখের সামনে
বড়ো হয় অনাদরে,
ওদের দুঃখে হয়ে যাই দুঃখী
আব্বুকে মনে পড়ে।
স্বাধীনতা-স্বাদ পেয়েছি আমরা
১৬ই ডিসেম্বরে,
যুদ্ধে শহিদ হয়ে যাওয়া সেই
আব্বুকে মনে পড়ে।

বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর

বেগম শামসুন নাহার

১৯৭১-এর মার্চে অগ্নিঝরা দিনে,
বজ্রকণ্ঠে শিকল ভাঙার গানে।
বীর বাঙালির অস্ত্রধারণ, অসহযোগ আন্দোলন,
বাঙালির অন্তঃপ্রাণ রণাঙ্গনে মুক্তির গান,
আকাশ-বাতাস, পদ্মা-মেঘনা ছাপিয়ে বান
রাখিব অটুট বাংলার মান।
লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা, একক মানচিত্র, একটি পতাকা
লক্ষ লক্ষ শহিদের রক্ত স্রোত,
শত শত নারীর সম্ভ্রমহানির ক্রোধ,
গৌরবগাথা বিজয় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১।
লাল-সবুজের পতাকায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ'
'ইতিহাস' ফিরে ফিরে আসে প্রতিবার।
কখনও মুছে যাওয়ার নয় প্রতিশোধের অঙ্গীকার।

বিজয়ের স্বাদ

অদ্বৈত মারুত

আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে আলো
ধূলির মাঝে উড়ছে রঙিন প্রজাপতি
বিজয়ের ফোটা নামছে বৃষ্টি হয়ে।

প্রাচীরের গায়ে ফোটাগুলো ভাঙছে
নীরবে, নিঃশব্দে; চোখ আলোমাখা
স্বপ্নের শেকল খুলে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস
মুক্তির এটাই প্রকৃত চিহ্ন।

অন্তরের অভ্যন্তরে, তারও গহিনে
একই সুর, একই গান
আরও গভীর হয়ে বাজে।

যেমন বাঁধনহীন আকাশে পাখি ওড়ে
নদী ছুটে চলে আপন গতিপথে, ধারায়
মাটি, ঘাস, সূর্য আলো মেশানো গোলাপ
অস্তিত্বের রঙে এক বিস্ময়কর সংগীত।

বিজয়ের স্নিগ্ধ হাওয়া অনুভবের
হৃদয়ের সীমানাহীন অস্তিত্বে অক্ষত
এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত– মুক্তির চাঁদ...।

স্বাধীনতা স্বাদ

বর্ণালী সান্যাল

সোনার ছেলের রাগ হয়েছে
খেলবে না আর তাই
কত বলে মান ভাঙিয়েছি
এইটুকু তার চাই
বলছি এবার পড়াশোনা কর মন দিয়ে
কত বড়ো চাকরি হবে পড়ায় মন দিলে
সে বলে পড়া দিয়ে কি হবে আর
আমার বন্ধু মাজেদ এবার প্রস্তুত
যুদ্ধে যাবার
সোনার ছেলেকে বলি কাজ নেই এসব দাও বাদ
চিৎকার দিয়ে আমায় বলে
পেতে হবে তো সকলেরই
স্বাধীনতার স্বাদ
এমন কথা শুনে আমার বুকটি ওঠে কেঁপে
কত কিছু ঘটবে সেথায় এমন কথা ভেবে
অবশেষে এলো সেই যুদ্ধ দামামার বেশ
সোনার ছেলে কিনতে গেল স্বাধীনতার তেজ
সবাই ফিরল নতুন স্বাদের স্বাধীনতা নিয়ে
সোনার ছেলে ফিরল শুধু রক্তটুকু দিয়ে।

বিজয়

কাদের বাবু

বিজয় হলো আনন্দ আর উল্লাসেরই ছোঁয়া
বাংলা মায়ের প্রাণ খুলে আবেগ ভরা দোয়া।
বিজয় হলো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার আশ
সত্য এবং ন্যায়ের কথায় স্বস্তির নিশ্বাস।

বিজয় হলো নতুন একটি দেশকে গড়ে তোলা
মনের সুখে গাইতে পারা, মনে যে দেয় দোলা।
বিজয় মানে ইচ্ছেমতো সুখ-স্বপ্ন দেখা
বিজয়-পটভূমিকাতে গল্প-ছড়া লেখা।

বিজয় মানে নিত্যনতুন কিছু সৃষ্টি করা
বিশ্বজগৎ ঘুরে বেড়াতে হাতির রথে চড়া।
বিজয় মানে গরুর গাড়ির পথটা আঁকাবাঁকা
ইচ্ছে হলেই রংতুলিতে যা খুশি তাই আঁকা।

ঐকতানের বিজয়

এস এম তিতুমীর

আকাশ ভার। তার, দৃষ্টি তলে চলে।
অসংখ্য মানুষ, মানুষের ঢল
প্রমিথিউসের আগুন অবিকল। লকলকে
চোখে, দাউ দাউ। জ্বালানোর শিখা
লিখা, কপালে বর্ণমালা। কর্পোরেট বাণী

ততখানি, যতখানি ঊর্ধ্বে উঠে অমূল্য জয় ক্ষয়,
অক্ষয় প্রাণের নিশান। নেমে আসা পথ
বেহেস্তি রথ, পিচঢালা পায়ের নীচে এসে থামে
ঘামে, জনতার লোহু। নামে, ফেরারি অপমানে।

তখনো বৃষ্টি ঝরেনি। করেনি আর্তনাদ, ব্যথার শিরা
হীরা, তার মত ছড়িয়ে দ্যুতি। প্রতিশ্রুতি, গায়ে মেখে
রেখে, হাত প্রিয় হাতে। গেলাম, এই অস্ফুট বোল
রোল, তুলে রাজপথে। ক্ষুরধার ক্ষতে, সাগর সমান বুক
সুখ, আসে পেতে দিয়ে। নিয়ে, মুগ্ধ'র জলের তরল

ঝরেছে এবার রক্ত। শক্ত, মাটির ওপর। জনতার দ্বেষ
দেশ, উত্তালে অববোধ। প্রতিরোধ, প্রতিবাদে নর-নারী
তারই, মত্ততায় প্রহ্লাদ। ইলেক্ট্রা, মেডুসা, কাসান্দ্রা
অ্যান্টিগোন, গার্গী, ইলা মিত্র, প্রীতিলতার চেতনা জারি
ভারি, শাসকের কাছে। রুদ্ধ শ্বাস, অবরুদ্ধ অত্যাচারী

আমিই পারি, ভাঙতে শৃঙ্খল, আমিই তো তনয়া-তনয়
ঐকতানের নেই পরাজয়, ওই তো বিজয়, ওই তো বিজয়।

মুক্ত বাংলাদেশ

বোরহান মাসুদ

রৌদ্র দুপুর উপুড় হয়ে সূর্য এসে নামে
ক্লান্ত কৃষক পথের মাঝে গাছের ছায়ায় থামে।
আষাঢ়-শ্রাবণ মেঘ গুড়গুড় ঝরঝরিয়ে ঝরে
লাল মাটির ওই গন্ধ সোঁদা যায় ছড়িয়ে ঘরে।

সবুজ হাসে অবুঝ মনে পথের বাঁকে বাঁকে
স্বর্ণলতা যায় জড়িয়ে বরই গাছের শাখে।
টুপটুপাটুপ বিষ্টি ঝরে মেঘনা নদীর বুকে
কানি বকে ঝাপটা মারে জল থইথই সুখে।

মাছের খেলা গাছের মেলা ছোট্ট সবুজ গাঁ
নদীর পাড়ে বসে আছে ঐ যে আমার মা।
রং-বেরঙের ফড়িংগুলো যায় রাঙিয়ে বন
দল হারিয়ে জল ছাড়িয়ে উদাস খোকার মন।

এমন মায়ার স্বদেশটাকে লুটে নিতে কারা
পেছন থেকে খুব গোপনে করছিল পাঁয়তারা।
শকুনগুলো আসলে উড়ে পালায় না কেউ ডরে
রক্ত ঢেউয়ে উতাল নদী, স্বাধীন দেশের তরে।

যুদ্ধ শেষে বিজয় আসে হাসে বাংলাদেশ
মুক্ত পাখি মুক্ত ডানায় ছড়ায় হাসির রেশ।

বিজয়ের গান

সুরজিত বৈদ্য

রক্তে লেখা ইতিহাস, বজ্রের মতো তীব্র,
শহিদদের ত্যাগে গাথা স্বাধীনতার চিত্র।
লাল-সবুজের পতাকা ওড়ে, গৌরবে আর দম্ভে,
বাংলা মায়ের জয়গান গায়, বিজয়গাথা স্মরণে।

পঁচিশে মার্চ রাতের আঁধার, ছিল নিশ্বাস থমকে,
রক্তস্নানে ভোর হলো একাত্তরের উন্মুখ রঙে।
নয় মাসের যুদ্ধ শেষে, এল সেই ডিসেম্বর,
শত্রু ভুলে পালায় যেথা, গর্জে উঠে সুনামি খড়্গ।

এই বিজয় শুধুই দিন নয়, চেতনার এক দীপ্ত আলো,
নতুন প্রজন্ম বয়ে নিয়ে যায়, আশার অগ্নিশিখা ভালো।
বাংলা আমার গর্ব, আমার চেতনা প্রাণ,
বিজয়ের এই কবিতা হোক– বাংলার চিরকাল গান।

সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্বরে '৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন— পিআইডি

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে সরকার

দেবব্রত রায়

মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে প্রতিটি মানুষের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছেন যারা শারীরিক, মানসিক বা সংবেদনশীল সীমাবদ্ধতার কারণে স্বাভাবিক জীবনের পথ থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকেন– তাদেরই আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে চিনি। সমাজের এ জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে প্রতিবছর ৩রা ডিসেম্বর পালিত হয় 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস'।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালনের পেছনে যে ঘটনাটি জানা যায় তা হলো– ১৯৫৮ সালের মার্চে বেলজিয়ামে খনি দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিকের মৃত্যু এবং পাঁচ সহস্রাধিক শ্রমিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়লে অনেক সামাজিক সংস্থা তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজে এগিয়ে আসে। পরের বছর আন্তঃদেশীয় স্তরে এক বিশাল সম্মিলনে সর্বসম্মতভাবে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়। সেই আহ্বানের সূত্র ধরেই ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

প্রতিবন্ধী দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো–প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, সুযোগ এবং মর্যাদা নিশ্চিত করা। এ দিবসটি সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করে, যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্য, অবহেলার শিকার না হয়। এ দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়– তাদের জীবনে অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা নয়; প্রয়োজন সুযোগ, সহানুভূতি ও সমর্থন। এই দিবসটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যসেবায় তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানায়। প্রতিবন্ধী দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সমঅধিকারের প্রতীক। সমাজের সকলে মিলে যদি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলে, তবে প্রতিবন্ধীরা হতে পারে সমাজের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যথাযথ মর্যাদায় ৩রা ডিসেম্বর '৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস' ও '২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৪' পালিত হয়। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ, বিকশিত নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে প্রতিবন্ধী জনগণ'। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্বরে ৩রা ডিসেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী

ব্যক্তিদের উন্নয়ন মেলাও অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৃতিগতভাবে বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রতিবন্ধীগণ আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের এই বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সঠিক পরিচর্যা ও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে তারাও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা এক বাণীতে বলেন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের কল্যাণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিনামূল্যে সেবাসহ সহায়ক উপকরণও পেয়ে থাকেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শ্রবণ, বুদ্ধি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় চালু রয়েছে। এ বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীর জন্য আবাসিক সুবিধা রয়েছে।

তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসিক ও প্রশিক্ষণ সুবিধা এবং পুনর্বাসন চিকিৎসা প্রদানের জন্য ঢাকার মিরপুরে একটি মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এ কমপ্লেক্সে এনডিডিসহ বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ শেল্টার হোমের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুর বাবা-মা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত থাকেন। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নানামুখী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অটিজম ও এনডিডি শিশুদের জাতীয় জীবনের মূলধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে কাজ করছে সরকার উল্লেখ করে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, বিশেষ মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে আগামী দিনের বাংলাদেশ গঠনে তারাও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে। ৩রা ডিসেম্বর রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে ৩৩তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৬তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

এসময় উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেন, সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে তারা সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ জানান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দরিদ্রতা ও সমস্যার কথা বিবেচনা করে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা-উপবৃত্তি, আর্থিক অনুদান, শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা চালু রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ৪৫টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস সেবা, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, কর্মজীবী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস, ৭৪টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সাভারে ১২.০১ একর জমির ওপর ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় সকল আইন ও বিধিবিধানের পাশাপাশি যুবসমাজের স্বপ্নকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহুমুখী সংস্কার পরিকল্পনা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনাগুলোর সফল বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত সচেতনতাও জরুরি। তাদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, হুইলচেয়ার প্রবেশযোগ্য অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা জরুরি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো– আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন। তাদের সহানুভূতির চোখে নয়, সমঅধিকারের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তাই প্রতিবন্ধী দিবস কেবল একটি দিবস নয়, এটি একটি প্রতিজ্ঞা– যেখানে আমরা সবাই একসাথে মিলে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক সমাজ গড়ার সংকল্প করি। প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সঠিক সহযোগিতা পেলে তারাও হতে পারে সমাজ ও জাতির অগ্রগতির অন্যতম স্তম্ভ।

দেবব্রত রায়: প্রাবন্ধিক

পতাকার অহংকার

প্রত্যয় জসীম

শিমুল পলাশ কিংশুকের বনে অবিরাম
দুলতে থাকে রক্তলাল জামা গায়ে
বিজয়ের লাল সবুজ পতাকা আমার
মুক্তি আর বিজয়ের দ্রোহী অহংকার।

কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে লাল ফুলগুলো
কার গান গায় বার বার
বাংলার আকাশ কেন থাকে নীল নীল
সিঁদুর সন্ধ্যাগুলো কেন কাঁদে এখনো
বিজয়ের পতাকা কাঁদে কার বেদনায়
দেশের জন্য যাঁরা দিয়েছে প্রাণ বিসর্জন...।

রক্ত গোলাপ কেন এমন রক্তলাল
শিমুল পলাশ কিংশুকের বনে বনে
মিশে আছে লাখো শহিদের রক্ত।

বিজয় আর স্বাধীনতা চিরন্তন মুক্ত আকাশ
অবিনাশী রক্তের দ্যুতিময় আল্পনা...
পাঁজরে রেখেছি বেঁধে অনির্বাণ ইতিহাস
সেই ইতিহাস বিপুল বিশাল- আল্পনা...।

বিজয়ের মুক্ত হাসি

সুজিত হালদার

আগুনের পরশমণি ছুঁয়েছে মনে
পর্বতের চূড়ায় রামধনু মেলেছে ডানা সংগোপনে
সে হাসছে অস্পর্শী-বিমূর্ত বিজয়ের মুক্ত হাসি।
বিজয়ের গৌরবান্বিত মুহূর্তকে স্পর্শ করতে
আমি সেদিন পাখি হয়ে উড়েছিলাম বনে বনে
মিছিলের অগ্রভাগে, শঙ্খচিল, শালিকের বেশে।
প্রজাতির চোখে ভয়ার্ত মৃত্যুর উড়ান দেখেছি
বিভীষিকাময় অসীম সাহসী মাছরাঙার ঠোঁটে এঁকেছি
বাংলাদেশের রণচণ্ডী বিজয়ের মানচিত্র।

অতঃপর অজস্র পাখির চোখে আমি দেখলাম,
হাজারো বুকের রক্ত কষে পলাশ হয়েছে লাল!
দূর্বাদল সবুজের বুক হয়েছে রক্তাক্ত বৃত্তাকার
অবারিত মুক্তির নেশায় শিমুল ফুটেছে বনে
লক্ষকোটি মানুষের মুষ্টিবদ্ধ হাত ছোঁয়া রণে
বোনের সম্ভ্রম আর ভাইয়ের আত্মদান শেষে
অর্জিত হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত চূড়ান্ত বিজয়।

তেপ্পান্ন বছর পরে

সেহাঙ্গল বিপ্লব

দিতে পারি প্রাণ দেবো না তো মান নিজের সঙ্গে চুক্তি
ছেলেটির নাম বিজয় এবং মেয়েটির নাম মুক্তি।
যুদ্ধ করবে দেশের জন্য লড়বে অকুতোভয়
জন্মভূমিকে হায়নামুক্ত করেই আনবে জয়।

বাঁচার জন্য সেই থেকে আজও যুদ্ধে যাওয়ার বেলা
দিয়েছি, দিচ্ছি অসংখ্য প্রাণ রক্তে লাশের ভেলা।
সেদিনের সেই নয়টি মাসের ব্যবধানে লাখো লাখ
বাস্তু-ভিটা ও মা-বোনের সম্ভ্রমের হিসেব থাক।

বিজয় যে আসে, আসে না মুক্তি, মুক্তি আসবে কবে?
মুক্তি পেতে কি জনম জনম শুধুই লড়তে হবে?
মুক্তি চেয়েছি অভাবের থেকে, সামাজিক পথচলায়,
শ্রেণি গড়বো অবৈষম্যের
এবং শিল্পকলায়।

দুর্ভাগাদের জন্মভূমির আনন্দহীন নীড়ে
মুক্তি ছাড়াই বছর বছর আসছে বিজয় ফিরে।

সবাই তো জানি যুদ্ধ জিতেই বিজয় ফিরেছে বাড়ি,
বিজয় আনছে স্বাধীন বার্তা চড়ে সে দুঃখের গাড়ি।

কে আনে মুক্তি, কে শোনে যুক্তি, শুধুই যে আশ্বাস,
প্রতারণা সারে গজিয়ে উঠছে হৃদয়ে মলিন ঘাস।
বিজয় তোমাকে স্বাগত জানাই তেপ্পান্নটি বছরের পরে
তুমি-ই আনবে বিজয়োৎসব প্রতিটি বাঙালির ঘরে।
এই প্রত্যাশা নাগরিক মনে কবি চায় কিছু ভিন্ন,
ঝুলকালি মুছে নতুনের পথে আঁকবে আলোর চিহ্ন।

বিজয় মুখর প্রিয়দিন

সোহরাব পাশা

একদিন
ভালোবাসার নিবিড় ছায়া পোড়ে
নিভে যায় প্রিয় চোখের স্নিগ্ধ দ্যুতি,
মেঘে ছিল না বৃষ্টির শব্দ,
সাঁতার ভুলে ছিল নদীর
গ্রীবা,

বড়ো কুহক সময় ছিল মানুষের
সববাড়ি ভুলে ছিল মানুষের ছায়া
ভালোবাসা–চুম্বনের কোলাহল
তবুও মানুষ পরাস্ত হয় না ,

মানুষ ভোলে না,
অন্ধকার ভাঙা রোদের তুমুল শব্দ
বিহঙ্গের ডানার মুখর ধ্বনি;

রাত্রির গোপনে ছিল
গোলাপ ফোটানো ভোর
রৌদ্রবীজ– আগুনের,

হঠাৎ বসন্ত ডেকে ওঠে
ডেকে ওঠে শহিদমিনার
ডেকে ওঠে বধ্যভূমি;

অবাক বসন্ত লাল ফুল
স্নিগ্ধ ভোরের রোদ্দুর–
এভাবেই বাংলাদেশ সেদিন
খুঁজে পায় বিজয়ের স্বপ্নদিন
ভালোবাসার -আনন্দ মুখর ভাষা ।

বিজয় মানে

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

বিজয় মানে–
আকাশজুড়ে
ছড়িয়ে থাকা
নতুন প্রাণের ছন্দ,

বিজয় মানে–
বাগানজুড়ে
ফুটে থাকা
গোলাপ ফুলের গন্ধ।

বিজয় মানে–
উদাস দুপুর
বটের মূলে
রাখালিয়া বাঁশির সুর,

বিজয় মানে–
রাঙা সূর্য
ফর্সা সকাল
আনন্দে ভরপুর।

বিজয় মানে–
নিত্যঝরা
নির্ঝরিণির
হাজারো কলতান,

বিজয় মানে–
মুক্তকণ্ঠে
গেয়ে যাওয়া
স্বাধীনতার গান।

বিজয়ের দিন

মোল্লা আলিম

ধ্বংসের খেলায় বিভোর ছিল
যখন পাকিস্তান
বুকের তাজা রক্ত দিলো
এদেশের সন্তান।

দেয়নি তো মান রক্ষা করে
এ দেশ মাতৃভূমি
তোমার জন্য জীবন দিয়ে
ধন্য হবো আমি।

নয় মাসে এমন খেলা
খেলে পাকিস্তান
কলঙ্কের হার গলায় পরে
দেশে ফিরে জান।

জয় হলো মুক্তিসেনার
মুক্ত করলো দেশ
বিজয় এনে দিলো তারা
আনন্দের নেই শেষ।

বিজয়

সুবর্ণা অধিকারী

জন্মভূমি জ্বলে পুড়ে
রক্তগঙ্গায় ভাসে
দশমাস দশ দিনে নয়
জন্মিছে নয় মাসে ।

তিরিশ লক্ষ ভাই হারিয়ে
মা বোন কত শত
ছোট্ট বিজয় আকুতোভয়
হয়নি আশা হত।

গোলা বারুদ ট্যাংক বেয়নেট
বুটের ভারী শব্দ
বর্বরতায় হার মানেনি
হয়নি বিজয় স্তব্ধ ।

বুদ্ধি বিকেক হত্যা করে
পশ্চিমা ওই পশুর দল
কালো রাতে ক্ষত দেহে
অটুট ছিল মনোবল।

বিজয় নামে এই ছেলেটি
একাত্তরে জন্ম যার
একবিংশ শতাব্দীতে
পরিপূর্ণ সত্তা তার।

চলে গেলেন কবি হেলাল হাফিজ

শফিকুল ইসলাম

প্রেম ও দ্রোহের কবি হেলাল হাফিজ চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১৩ই ডিসেম্বর দুপুরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন দেশবরেণ্য এই কবি। মৃত্যুকালে চিরকুমার এ কবির বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। সংসারবিমুখ কবির জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছে রাজধানীর শাহবাগের সুপার হোম নামের একটি হোস্টেলে। হোস্টেলের বাথরুমে পড়ে গিয়ে তাঁর রক্তক্ষরণ হয়। এরপর বিএসএমএমইউ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ১৪ই ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি ও জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে দুই দফায় জানাজা ও শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তাঁকে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

কবি হেলাল হাফিজের জন্ম ১৯৪৮ সালের ৭ই অক্টোবর নেত্রকোণার আটপাড়া উপজেলার বড়তলী গ্রামে। তাঁর বাবার নাম খোরশেদ আলী তালুকদার, মায়ের নাম কোকিলা বেগম। তাঁর শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য কেটেছে নিজের শহরেই। তিনি ১৯৬৫ সালে নেত্রকোণা দত্ত হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৬৭ সালে নেত্রকোণা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ঐ বছরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় ১৯৭২ সালে তিনি তৎকালীন দৈনিক *পূর্বদেশে* সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন *দৈনিক পূর্বদেশের* সাহিত্য সম্পাদক। ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে তিনি *দৈনিক দেশ* পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক পদে যোগদান করেন। তিনি *দৈনিক যুগান্তরের* শুরু থেকে দীর্ঘদিন সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া কবি হেলাল হাফিজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য ছিলেন।

উত্তাল ষাটের দশক ছিল তার কবিতার উপকরণ। ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের সময় রচিত 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতা তাঁকে কবিখ্যাতি এনে দেয়। তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে মিছিলের স্লোগান। 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়/এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়' কালজয়ী কবিতার এ লাইন দুটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পরবর্তী সময়ে নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ সকল মুক্তির আন্দোলনে কবিতাটি মানুষের মাঝে তুমুল সাড়া জাগায়।

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত প্রথম কবিতাগ্রন্থ *যে জলে আগুন জ্বলে* কবিকে নিয়ে যায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এরপর বইটির ৩৩টির বেশি সংস্করণ বেরিয়েছে। দীর্ঘসময় নিজেকে অনেকটা আড়ালে সরিয়ে নিয়েছিলেন কবি হেলাল হাফিজ। প্রায় আড়াই দশক পর ২০১২ সালে তিনি পাঠকদের জন্য আনেন দ্বিতীয় বই *কবিতা একাত্তর*। তৃতীয় এবং সর্বশেষ বই *বেদনাকে বলেছি কেঁদো না* প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে।

লড়াইয়, সংগ্রাম, প্রেম-বিরহ, দ্রোহে যাপিত জীবনের পরতে পরতে হেলাল হাফিজ স্পর্শ দিয়ে গেছেন। 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়'র মতো 'অগ্ন্যুৎসব' কবিতাও শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন জ্বেলে দেয়। কেবল মুক্তিযুদ্ধ কিংবা গণ-অভ্যুত্থানের মতো প্রেক্ষাপটে নয়, যে-কোনো অন্যায়ে-শোষণে-অবিচারে হেলাল হাফিজের এ উচ্চারণ সবার হয়ে ওঠে।

তিনি ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া কবিতার জন্য তিনি পেয়েছেন নারায়ণগঞ্জ বৈশাখি মেলা উদ্‌যাপন কমিটির কবি সংবর্ধনা (১৯৮৫), যশোর সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৬), আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), নেত্রকোণা সাহিত্য সমাজ, কবি খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পদক সম্মাননা, বাসাসপ কাব্যরত্ন ২০১৯ প্রভৃতি। ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালে তিনি মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন।

কবি হেলাল হাফিজের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, দ্রোহ ও প্রেমের কবি হেলাল হাফিজের মৃত্যু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যাঙ্গনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। কবি হেলাল হাফিজ ছিলেন তারুণ্যের শক্তি এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সাহসী কণ্ঠ। তাঁর কালজয়ী কবিতার মতোই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে। এছাড়া সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজসহ কবি, সাহিত্যিক ও খ্যাতনামা ব্যক্তিরা শোক প্রকাশ করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

Meet Bangladesh : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000
Birds of Bangladesh : 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Wildlife of Bangladesh : 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250
Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division : 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200
Tourist Attractions in Bangladesh- Khulna Division : 184 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 800
Tourist Attractions in Bangladesh- Barishal Division : 136 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 700

নবারুণ

এখন মোবাইল অ্যাপ্স-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নবারুণ
পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

Bangladesh Quarterly

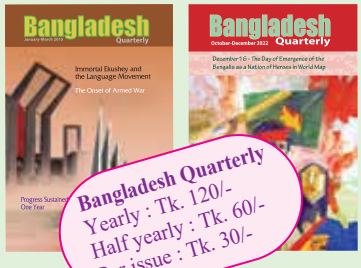

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল-সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com ; dfpsb1@gmail.com
নবারুণ : editornobarun@dfp.gov.bd
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 06, December 2024, Tk. 25.00

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে সেক্টর কমান্ডাররা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd